বিশ্বের সেরা গল্প-চয়ন

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার নূতন সিলেবাস অনুযায়ী পঞ্চম [illegible] শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত।

সংশোধিত নূতন সংস্করণ ১৯৮৭

বিশ্বের সেরা গল্পচয়ন

প্রণব বাহুবলীন্দ্র
অধ্যাপক, তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়

ময়না প্রকাশনী
১৪/এ টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী পুষ্পরাণী সাহু
সোমনাথ প্রকাশনী
ময়না, মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান :

মধুসূদন বুক স্টল

১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা :
দেবদত্ত নন্দী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ও ব্লক নির্মাণে :
ইউনিক্ প্রিন্ট এন্ড প্রসেস
৬১এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, '৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী, '৮৩
তৃতীয় সংস্করণ : মে, '৮৩
সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ :
জানুয়ারী, '৮৪
পঞ্চম সংস্করণ : জানুয়ারী, '৮৫
সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ :
জানুয়ারী, '৮৭

মুদ্রাকর :
করুণাময়ী প্রেশ
৯/৭বি প্যারি মোহন সুর লেন।
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : দশ টাকা মাত্র।

"শুভারম্ভ"

পৃথিবীটা বড় বিশাল। নানান দেশ, নানান ভাষা, নানান ধর্ম, নানান ইতিহাস। একটার সাথে একটার মিল নেই। আবার তলে তলে সকলের সাথে সকলের মিল। আমাদের ছোট্ট বইতে রয়েছে তারই সামান্যতম প্রতিচ্ছবি।

অপরকে বুঝতে চেষ্টা করাই হল মানুষের জীবনে শিক্ষার সবচেয়ে বড় সোপান। কাউকে দূরে ঠেলে দেওয়া নয়, বরং সবাইকে কাছে টেনে নেওয়াটাই আসল দীক্ষা। পাপড়ি মেলে ধরার আগে, কুঁড়ি ফোটার সাথে সাথে, একেবারে ছেলেবেলা থেকে সেই বিদ্যা শুরু করা উচিত। যদি অপরিচয়ের বাধা ঘুচে যায়, তবে আপনজন বেছে নিতে কোন অসুবিধে হয়না। জন্মায় অগাধ ভালবাসা।

সমস্ত গ্রন্থ, সমস্ত ধর্মে লেখা রয়েছে ভাল ভাল কথা। ভাল ভাল উপদেশ। তার তলানিটুকু ছেঁকে নিলেও পরম উপকার। সত্যিকারের মানুষ হতে হলে নিজের জিনিসের সাথে অন্যের মধুর জিনিসটুকুকেও গ্রহণ করা উচিত।

সূচীপত্র

তুচ্ছ এক সঙ্গী

[পঞ্চতন্ত্র ।। বহুকাল আগে দক্ষিণভারতে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। রাজার নাম অমরশক্তি। রাজার তিনজন পুত্রই ছিল মহামূর্খ। এজন্য রাজার মনে সুখ ছিলনা। রাজা বলতেন : 'যদি কোন পুত্র না থাকে, সে দুঃখ তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু মূর্খ পুত্র থাকা কোনমতে ভাল নয়। তার কারণ, সারাজীবন ধরে কেবল তাকে দুঃখ বয়ে বেড়াতে হবে।' অবশেষে মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বিষ্ণুশর্মা প্রতিজ্ঞা করলেন—মাত্র ছ'মাস সময়ের মধ্যে তিনি রাজপুত্রদের শিক্ষিত করে তুলবেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা সফল হল। ছোট ছোট বহু গল্পে ভর্তি 'পঞ্চতন্ত্র' লেখা হয়েছিল রাজপুত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য। কৃতজ্ঞ রাজা একশত গ্রাম দান করতে চাইলেন। বিষ্ণুশর্মা বললেন : মহারাজ, আমি অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রয় করিনা।

সংস্কৃত ভাষায় এই গল্পগুলি লেখা হয়েছিল দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগে। পৃথিবীর নানা দেশে অন্ততঃ পঞ্চাশটি ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়। গল্পগুলি এইভাবেই যুগ যুগ ধরে ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চতন্ত্র খুবই বিখ্যাত গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে পাঁচটি ভাগ—মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধ-প্রণাশ, অপরীক্ষিত-কারক।]

বিদেশ রওনা হচ্ছে ছেলে।

ভোরের আলো তখনো ঠিকমত ফুটে ওঠেনি। আকাশ কত সুন্দর, বাতাসও বড় মধুর। সবকিছুতে যেন ভাল লাগার ঢেউ। গুরুগৃহে যাবে ছেলে। টুকিটাকি সব জিনিসপত্র দিয়ে পুঁটলিটা গুছিয়ে দিলেন মা। ছেলেকে কাছে টেনে আনলেন। তারপর কপালে আঁকালেন স্নেহের চুম্বন।

সবার শেষে মায়ের পা ছুঁয়ে ছেলে প্রণাম জানাল। মায়ের চোখদুটি ছলছল করে উঠল। বিদ্যা শিক্ষা করতে ছেলে যাচ্ছে দূর দেশে। তাতে বাধা দেওয়া কোনমতে ঠিক নয়। আবার অতটা পথ একাকী যাবে তার সাত রাজার ধন মানিক। এতেও যে মনটা সায় দেয় না।

চিন্তিত মনে মা শুধালেন ঃ বিদেশে বিভুঁইয়ে তুই একলাটি কি করে যাবি বাবা ?

হাসতে হাসতে ছেলে জবাব দিল ঃ মাগো, তুমি বড্ড ভীতু! আমি কি আগের মত ছোট্টটি আছি নাকি ? কত বড় হয়েছি দেখতে পাওনা! তাছাড়া সঙ্গী কোথায় পাব বল ?
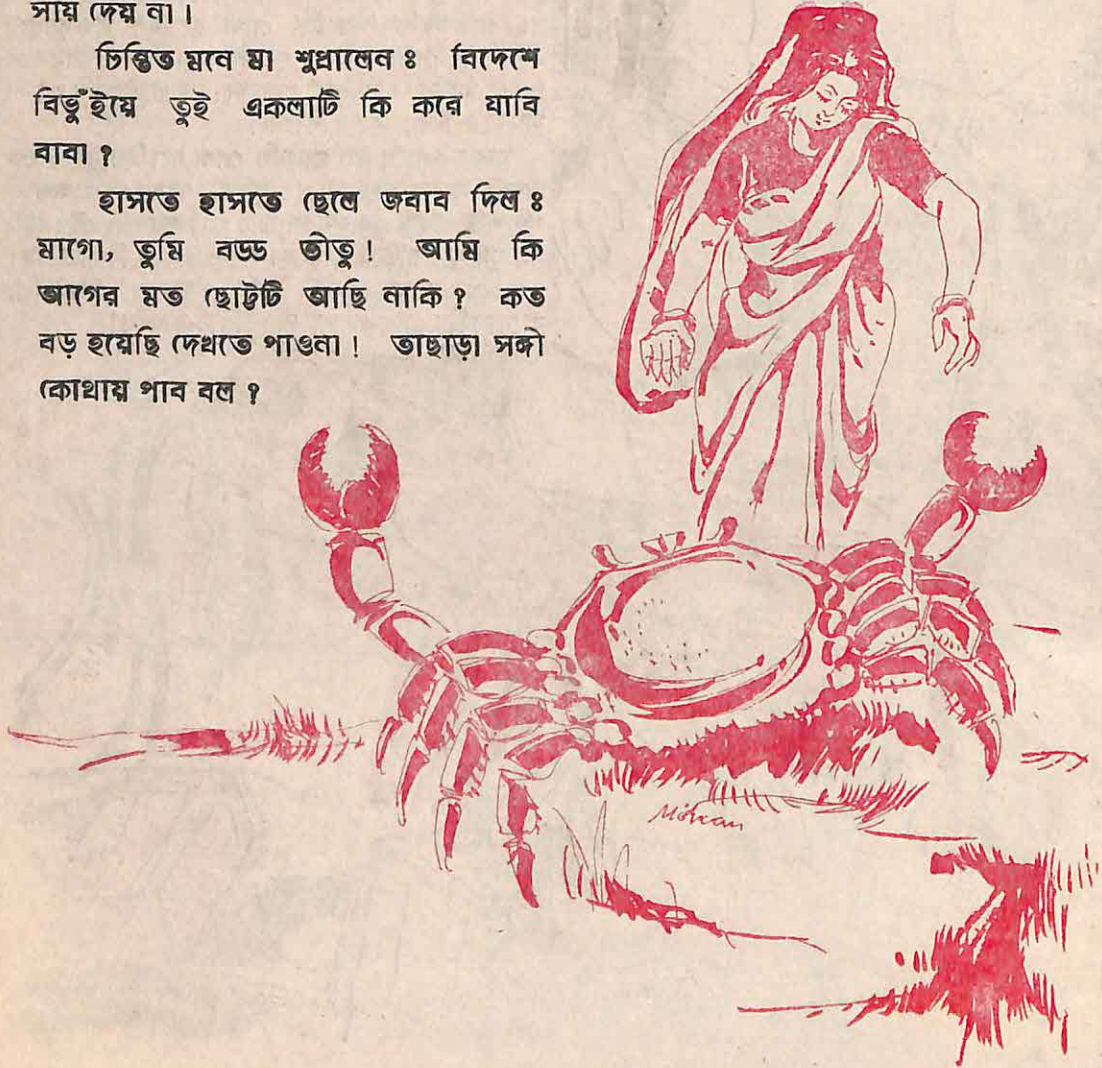
একটুখানি কী যেন ভেবে নিলেন মা। হঠাৎ দেখলেন, একটা কাঁকড়া চরে বেড়াচ্ছে কাছাকাছি ডোবার ধারে। চটপট সেটাকে তুলে আনলেন।

তারপর নিশ্চিন্ত গলায় ছেলেকে বললেন ঃ দূর পথে একা একা না যাওয়া ভাল। আর কেউ যখন নেই, এটাকেই তুই সঙ্গী করে নে।

ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ হচ্ছিল না ছেলের। সে জানাল ঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না মা। এখন এটাকে কোথায় রাখব বলতো ? মিছিমিছি একটা বোঝা বাড়ালে তুমি।

মা বললেন ঃ তোর পুঁটলির মধ্যে কর্পূরের একটা থলি আছে। তার মধ্যে কাঁকড়াটাকে ভরে রাখ।

মায়ের কথামত কাজ সেরে সাত তাড়াতাড়ি ছেলে এগিয়ে চলল। যতক্ষণ দেখা যায়, মা তাকিয়ে থাকলেন পলক না ফেলে। মুখে উচ্চারণ করলেন—'দুর্গা, দুর্গা'! মনে মনে প্রার্থনা জানালেন ঃ হে ঠাকুর, বাছাকে আমার রক্ষা কর, তার বিপদ-আপদ দূর কর। কল্যাণ কর, মঙ্গল কর।

* * *

একটানা পথ চলার পর ছেলেটি থামল ঠিক দুপুর বেলায়। সুয্যিদেব তখন মাথার উপর। ঠা-ঠা রোদে গা পুড়ে যাচ্ছে। শরীর যেন বইছে না। খুব ক্লান্ত লাগছে। এতটা পরিশ্রম হয়েছে। এবার দরকার বিশ্রামের।

রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বটগাছ। ঘনছায়া ছড়িয়ে পড়েছে তার নীচে। মনে হয়, কে যেন আঁচল পেতে রেখেছে সেখানে। তা দেখে ছেলেটি আর লোভ সামলাতে পারল না।

ছেলেটি তখুনি গাছতলায় বসে পড়ল। বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে দিল। আর পুঁটলিটাকে রাখল পাশে। গাছের গুঁড়িতে লাগাল পিঠ-ঠেস। ফুর-ফুর করে বইছে দখনে হাওয়া। ঠান্ডা আমেজে শরীর জুড়িয়ে গেল। দুটি চোখের পাতায় কখন যে ঘুম নেমে এসেছে, নিজেই তা জানে না।

এদিকে কিন্তু আর এক কাণ্ড। ছেলেটি নেতিয়ে পড়ল ঘুমে। আর গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক সাপ। কী বিরাট ফণা! লম্বা দু-ফালি জিভ লকলক করছে বিষে। খানিক পরে সাপটা ছোবল বসাবে ছেলেটির পায়ে।

মাত্র এক লহমা। তারি মধ্যে সাপটা চলে এল পুঁটলিটার কাছে। তার নাকে লাগল কর্পূরের সুগন্ধ। এমনিতে কর্পূরের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ সাপের বড় প্রিয়। তাই এর হদিশ পেয়ে সাপটা প্রথমে সেই দিকে ছুটে গেল।

খুঁজে খুঁজে থলিটা বের করল সাপ। পুরো কর্পূর গিলে ফেলবে, তার মনের সাধ ছিল এইরকম। থলির ভেতরে যেই না সে মুখটা ঢুকিয়েছে, কাঁকড়াটা অমনি বিরাট বিরাট দুটো

দাড়া দিয়ে সাপের গলা চেপে ধরল জোরে। অনেক চেষ্টা করল, বহুবার ফোঁস ফোঁস করল, তবু নিজেকে বাঁচাতে পারল না সাপ। ছটফট করতে করতে বেঘোরে মারা পড়ল।

এতক্ষণে কী যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেছে, ছেলেটি তা ভাবতে পারেনি। ঘুমে সে অচেতন। বিকেল বেলায় রোদ গড়ে যাওয়ার পর সে জেগে উঠল। আর আপনা থেকে দৃষ্টি পড়ল পুঁটলিটার দিকে।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে তার এতটুকু দেরী হল না। পুঁটলির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কর্প্পূরের থলি। তার ওপর পড়ে আছে মরা সাপ। যা তা সাপ নয়, একেবারে কালনাগিনী কেউটে। ছোবল বসালে রক্ষা থাকত না কারুর।

কাঁকড়াটা তখন দাড়া মেলে গুটিগুটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল একপাশে। ছেলেটি খুব খুশী হল। সামান্য একটা কাঁকড়া আজ তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। অথচ একেই সে আমল দিচ্ছিল না প্রথমে।

ছেলেটি আওড়াল ঃ দেখছি, মায়ের কথাই ঠিক। ভাল ভাল জিনিস একা খেতে নেই। সবাই ঘুমোলে একা জাগতে নেই। চিন্তা ভাবনা একা করতে নেই। একা পথ চলতে নেই। সঙ্গী যদি তুচ্ছ হয়, তাতেও অনেক উপকার।
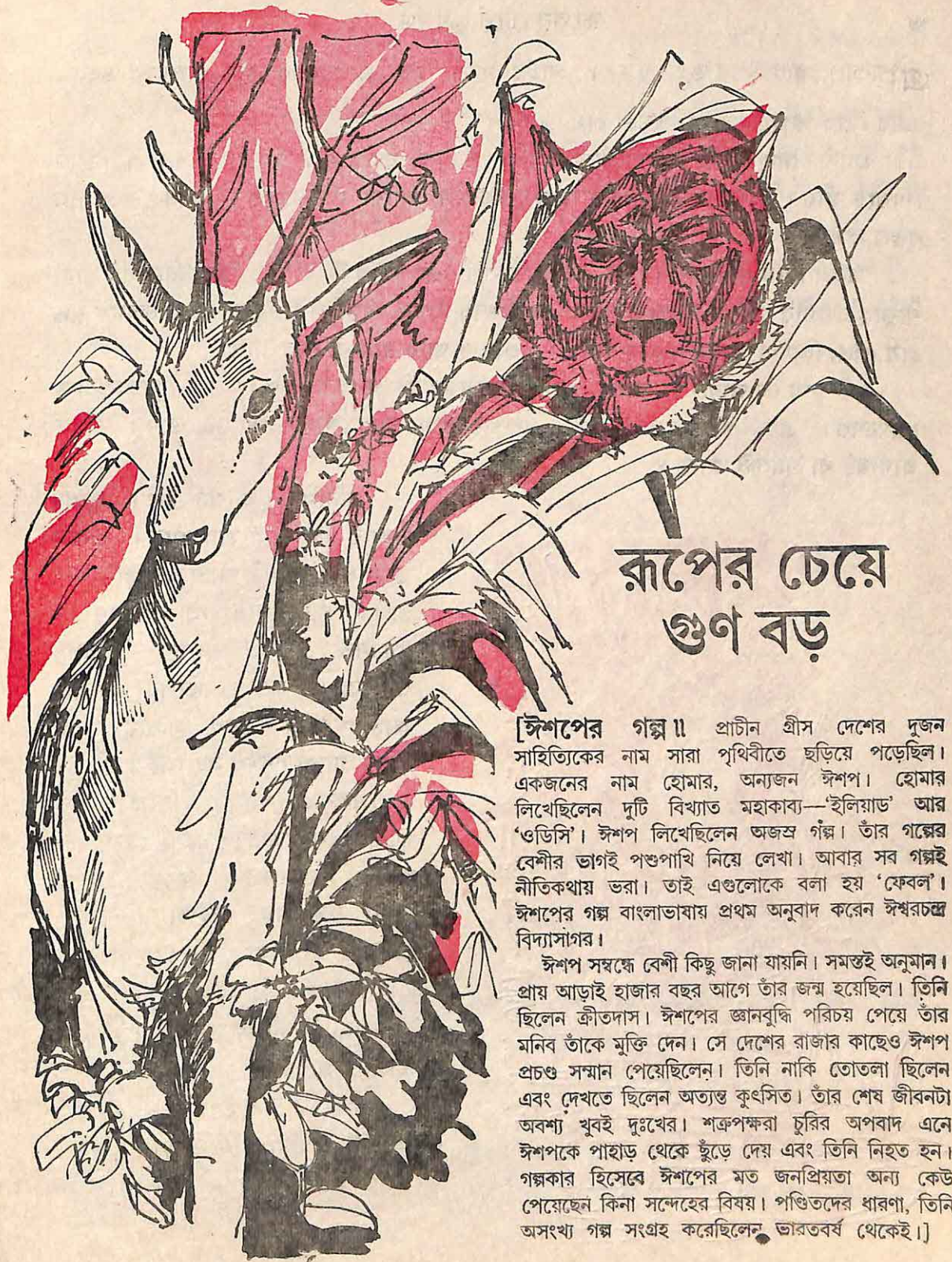
রূপের চেয়ে গুণ বড়

[ঈশপের গল্প ॥ প্রাচীন গ্রীস দেশের দুজন সাহিত্যিকের নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজনের নাম হোমার, অন্যজন ঈশপ। হোমার লিখেছিলেন দুটি বিখ্যাত মহাকাব্য—'ইলিয়াড' আর 'ওডিসি'। ঈশপ লিখেছিলেন অজস্র গল্প। তাঁর গল্পের বেশীর ভাগই পশুপাখি নিয়ে লেখা। আবার সব গল্পই নীতিকথায় ভরা। তাই এগুলোকে বলা হয় 'ফেবল'। ঈশপের গল্প বাংলাভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশপ সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায়নি। সমস্তই অনুমান। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন ক্রীতদাস। ঈশপের জ্ঞানবুদ্ধি পরিচয় পেয়ে তাঁর মনিব তাঁকে মুক্তি দেন। সে দেশের রাজার কাছেও ঈশপ প্রচণ্ড সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি নাকি তোতলা ছিলেন এবং দেখতে ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত। তাঁর শেষ জীবনটা অবশ্য খুবই দুঃখের। শত্রুপক্ষরা চুরির অপবাদ এনে ঈশপকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে দেয় এবং তিনি নিহত হন। গল্পকার হিসেবে ঈশপের মত জনপ্রিয়তা অন্য কেউ পেয়েছেন কিনা সন্দেহের বিষয়। পণ্ডিতদের ধারণা, তিনি অসংখ্য গল্প সংগ্রহ করেছিলেন ভারতবর্ষ থেকেই।]

আমিই কিনা পেয়েছি এমন বিচ্ছিরি হতকুচ্ছিত দুজোড়া পা ? ছি–ছি, এ যে বড় ঘেন্নার কথা। এ লজ্জা রাখার ঠাঁই কোথায় ?

ঝরণার পাশটিতে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল হরিণ। নিজেকে নিয়েই সে তখন আত্মহারা। বেশির ভাগ সময় শিং–জোড়ার জন্য অহংকার হচ্ছিল। আবার দুঃখ পাচ্ছিল পাগুলোর জন্যে। মনে মনে আওড়াল ঃ ঐরকম জঘন্য পাগুলো না থাকলেই ভাল হত।

হঠাৎ একটা বিকট গর্জন তার কানে ভেসে এল। আর তখুনি হুঁশ ফিরে পেল সে। দূর থেকে দেখল, একটা ভয়ঙ্কর বাঘ তার দিকে ছুটে আসছে। বিপদ একেবারে দোর গোড়ায়।

যেই্‌না দেখা, বনের ভেতরে হরিণ পালিয়ে গেল প্রাণের ভয়ে। অন্য কোন কিছু ভাবনার ফুরসৎ নেই। উর্দ্ধশ্বাস দৌড়। কথায় বলে, হরিণ লাফায় একুশ হাত। বাঘ–সিংহ তার চেয়ে কম। এই দ্রুতগতির জোরে বাঘ পেরে উঠল না। হরিণ চলে গেল অনেক তফাতে।

কিন্তু হায়! হরিণের কপালে এবার দুর্ভাগ্য নেমে এল। খুব বেশী দূর সে এগোতে পারল না। ঘন জঙ্গলের মাঝখানে সে আচমকা আটকা পড়ল। কেমন করে তার শিং–দুটো

গ্রীষ্মকাল, তার উপর ভরা দুপুর। সূর্যের তাপ যেন আগুনকেও হার মানাচ্ছে তখন। প্রখর রোদ সকলের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

এমনি সময় একটা হরিণ চরতে চরতে ঝরণার কাছে এসে দাঁড়াল। দারুণ তেষ্টা পেয়েছে তার। ঝরণার কাছাকাছি গিয়ে তেষ্টাটা আরো বেড়ে গেল। আকণ্ঠ জল পান করল প্রথমে।

তেষ্টা মিটে যাওয়ার পর সে একটা জিনিস লক্ষ্য করল। বারে! তার নিজেরই ছায়া পড়েছে ঝরণার জলে। বলতে গেলে, সে বেজায় চমকে উঠেছিল। তারপর একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, নিজের সুন্দর চেহারা দেখে। আনন্দ আর ধরে না যেন মনে।

খুশী হয়ে সে ভাবল ঃ আহা, আমার শরীরের কী অপরূপ রূপ। শিং–জোড়াও কত চমৎকার। এর কোন তুলনা নেই। কেমন লম্বা আর শাখা–প্রশাখায় ভরা। কোন প্রাণীরই বা এমনটি আছে ?

হরিণের খুব গর্ব হল। সুখের সাগরে সে তখন ডুবে গেছে। একটা ভাল লাগার ঢেউ আছড়ে পড়েছে তার মনে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সে নিজেকে দেখতে লাগল। কেবলই ভাবতে থাকল ঃ রূপের জেল্লায় আমার শিং–জোড়াকে হারিয়ে দেবে, বনের রাজ্যে তেমন বস্তু নেই।

এবারে পায়ের দিকে নজর পড়ল। আর তাকান মাত্রই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। ভগবান যাকে এমন চমৎকার চেহারা দিয়েছেন, তাকেই বা কেন দিলেন সরু সরু চারটে ঠ্যাং। এ যে একেবারেই খাপ খায় না। কেনই বা তার বরাতে জুটল এতবড় অবিচার ?

হরিণের যেন আর দুঃখ ঘুচে না। নিজেই নিজেকে সে ধিক্কার দিল ঃ এমন বাহারী সিং–জোড়া আমার।

জড়িয়ে গেল লতাপাতার ঝোপে। অনেকক্ষণ চেষ্টা করল, প্রাণপণ শক্তিতে টানা–হ্যাঁচড়া করল। তবুও জট খুলল না। লতাপাতার জাল থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারল না।

দেখতে দেখতে বাঘটা চলে এল। এই সুযোগটুকু তার কাছে যথেষ্ট। ভীষণ হুংকার তুলল বনবাদাড় কাঁপিয়ে। তারপর চোখের পলকও নামল না। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণের ঘাড়ে।

মৃত্যুর আগে হরিণ শুধু আক্ষেপ করল ঃ আমি কি বোকা। যে পাগুলোর নিন্দে করেছিলাম, তাদের দৌলতে এতটা ছুটলাম। আর যে শিংজোড়াকে এত প্রশংসা করেছি। আজ তাদের জন্য মরতে হল।

অন্তিম সময়ে হরিণ বুঝল ঃ রূপের কোন দাম নেই। রূপের চেয়ে গুণ অনেক বড়। গুণের কদর যে করে না, তার মত আহাম্মক কেউ নেই।

বিড়াল তপস্বী

[**হিতোপদেশ** ॥ পঞ্চতন্ত্রকে অনুসরণ করে বহু বই লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে হিতোপদেশ খুবই নামজাদা। সারাভারতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। হিতোপদেশ যিনি লেখেন, তাঁর নাম নারায়ণ পণ্ডিত। এঁর জন্ম বাংলায়। প্রায় হাজার বছর আগেকার মানুষ তিনি। হিতোপদেশের বেশীরভাগ গল্পই পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া, গুটি কয়েক অবশ্য একেবারে আনকোরা। বলে না দিলেও চলবে, এটি লেখা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। গল্পগুলি লক্ষ্য হল নীতিশিক্ষা দেওয়া। সেজন্য বলার ঢংটি অতি চমৎকার, নিতান্ত সহজ ও সরল।

পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে পাঁচটি ভাগ। হিতোপদেশে কিন্তু চারটি মাত্র ভাগ—মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। পঞ্চতন্ত্রের গল্পের শুরুতে আছে দক্ষিণভারতের মহিলারোপ্য নগর, আর রাজার নাম অমরশক্তি। এখানে কিন্তু উত্তরভারতের ভাগীরথী নদী, পাটলীপুত্র নগর, আর রাজার নাম সুদর্শন। রাজপুত্রেরা ছিলেন মহামূর্খ। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা তাদের শিক্ষিত করে তুললেন মাত্র ছ'মাসের মধ্যে। রাজার দুশ্চিন্তা ঘুচল। রাজা বললেন: 'সবকিছুর তুলনায় বিদ্যাই সেরা জিনিস। তার কারণ, কোনকালেই তা নষ্ট হয়না, কেউ চুরি করেও নিতে পারেনা।' বিষ্ণুশর্মা দফায় দফায় যে সমস্ত গল্প শুনিয়েছেন, সেগুলোই ঠাঁই পেয়েছে হিতোপদেশে।]

ভাগীরথী নদীর ধারে ছিল এক পাহাড়। সেই পাহাড়ে মস্ত বড় পাকুড় গাছ ছিল। তাতে বাস করত এক বুড়ো শকুন। তার নাম জরদ্গব।

জরদ্গব খুবই বুড়ো হয়ে পড়েছিল। চোখে সে কিছু দেখতে পেত না। তার নখেরও জোর কমে গিয়েছিল। খাবার-দাবার খোঁজাও তার পক্ষে কষ্টকর হত।

সেই পাকুড় গাছটিতে কিন্তু আরো অনেক পাখী বাসা বেঁধে থাকত। জরদ্গবের এই অসহায় অবস্থা দেখে তাদের দয়া হল। তাই সকলে মিলে বলল ঃ ওগো জরদ্গব, আমরা তোমাকে রোজ খাবার এনে দেব। তার বদলে তুমি কিন্তু আমাদের বাচ্চা-কাচ্চাগুলোর ওপর নজর রেখো।

জরদগব এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল। যে সমস্ত

পাখীর ছানাগুলোর ডানা ঠিকমত গজায়নি, যারা উড়তে পারত না, তাদের পাহারা দেওয়াই ছিল জরদ্গবের কাজ। অন্যান্য পাখীরাও ঠিক সময়ে তাকে খাবার পৌঁছে দিত। বলতে গেলে, সকলের সাহায্যে সে বেঁচে ছিল।

* * *

এইভাবে বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন একটা বিড়াল ঘুরতে ঘুরতে সেখানে হাজির হল। বিড়ালের নাম দীর্ঘকর্ণ। এতগুলো পাখীর ছানাকে একসাথে দেখে সে তো আহ্লাদে আটখানা। যাক, ধীরে সুস্থে এগুলোকে পেটে পোরা যাবে! তার জিভে জল এসে গেল।

হঠাৎ একটা বিড়ালকে দেখে পাখীর ছানাগুলো কিন্তু দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি আরম্ভ করল।

আর তাই শুনে কোটর থেকে বেরিয়ে এল জরদ্গব। বিরাট হুংকার তুলে সে বলল তুই কে রে? যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস তো এখুনি পালিয়ে যা। নইলে তোর ঘাড় মটকে দেব।

শকুনটাকে এতক্ষণ বিড়াল দেখতে পায়নি। আচমকা তার কথা শুনে বিড়ালও প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গেল। কিন্তু সে ছিল মহাধূর্ত। মনে মনে ভাবল ঃ এ তো দেখছি মহা বিপদ। বুড়োটাকে যদি ছলাকলায় ভুলিয়ে রাখতে না পারি, তাহলে নিজেরই প্রাণ বাঁচান দায়।

তারপর হাত জোড় করে বলল ঃ আর্য, আপনাকে প্রণাম জানাই। আগে আমার কথা শুনুন। যদি উচিত মনে হয়, তখন আমাকে বধ করবেন।

জরদ্গব বলল ঃ বেশ, তাড়াতাড়ি তোর কথা বল।

দীর্ঘকর্ণ আরম্ভ করল ঃ আমি ব্রহ্মচারী। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান সেরে পূজোআচ্চা নিয়ে থাকি। আপনি বিদ্যা ও জ্ঞানে অনেক বড়। আমি উপদেশ নিতে চাই। আপনার কাছে ধর্মকথা শুনতেই এসেছি। তাছাড়া আমি তো অতিথি। আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?

বিড়ালের মিষ্টি মিষ্টি কথায় জরদ্গব গলে গেল। বিড়াল থাকতে পেল সেখানে। জরদ্গবের আর তখন এতটুকু অবিশ্বাস নেই।

* * *

বিড়ালকে আর পায় কে? লুকিয়ে লুকিয়ে সে পাখীর ছানাগুলোকে সাবাড় করতে লাগল। গাছের একটা কোটরে হাড়ের স্তূপ জমে গেল। তারপর যখন সব শেষ, চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে, বিড়াল পালাল অন্য জায়গায়।

ছানাগুলোকে না পেয়ে পাখীরা শোকে দুঃখে অধীর। এক সময় তারা সেই কোটরটার ভেতর দেখল, অনেক হাড় জমে আছে সেখানে। তারা ভাবল ঃ জরদ্গব ছাড়া এই জঘন্য কাজ কেউ করেনি। সেই খেয়েছে বাচ্চাগুলোকে।

দারুণ রেগে পাখীরা সব একজোট হল। তারপর মেরে ফেলল বুড়ো শকুনকে। বেচারা জরদ্গব মারা পড়ল বিনা দোষে।
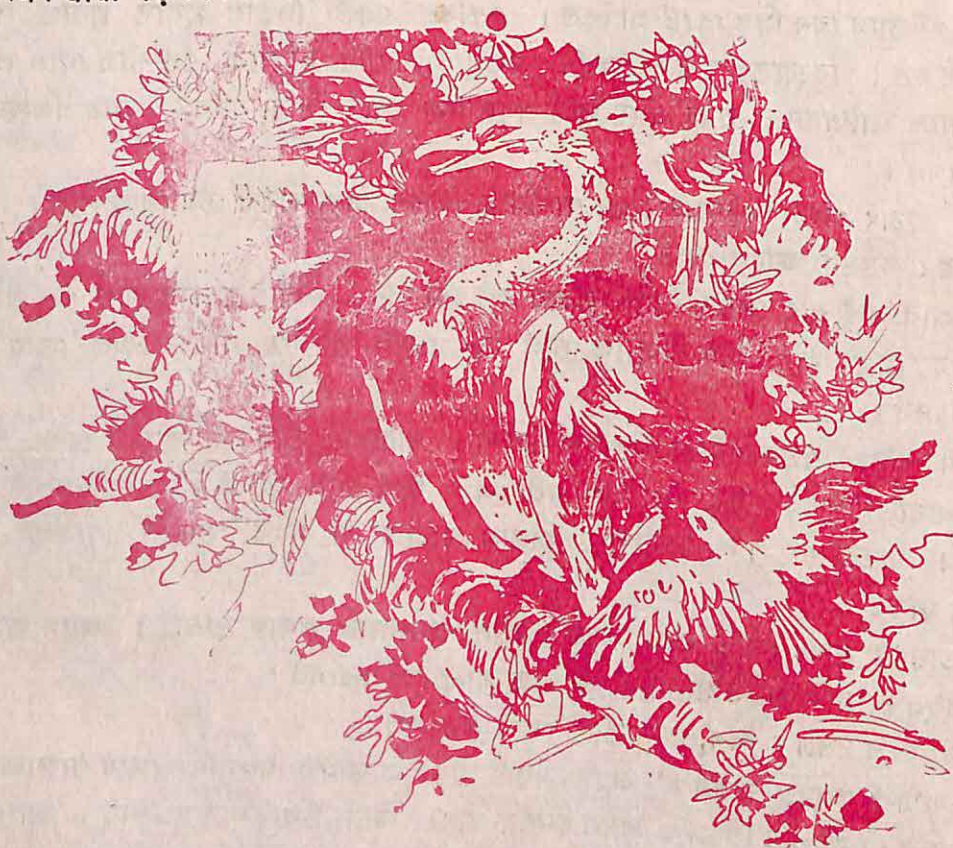
মরে যাওয়ার আগে জরদ্গব একটা খাঁটি কথা শিখেছিল। সে বুঝল ঃ যাকে চিনিনা জানিনা, তাকে কখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করা উচিত নয়। অজ্ঞাত কুলশীলদের যদি ঘরের ভেতরে ঢোকাই, তাহলে, বিপদ দেখা দেবেই।
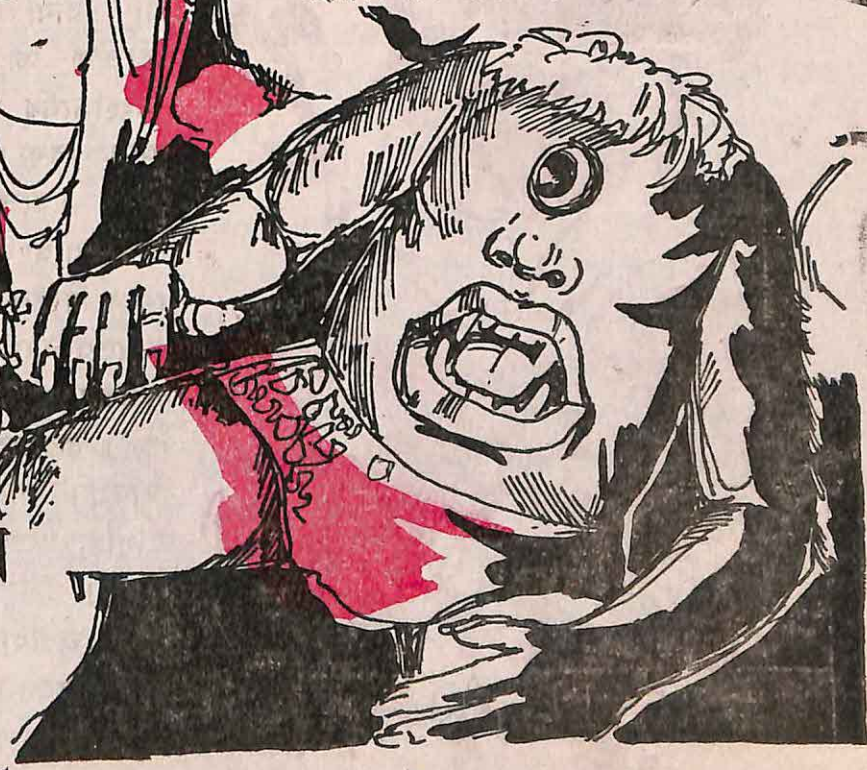
[**রামায়ণ** ॥ গোটা পৃথিবীতে মহাকাব্যের সংখ্যা মাত্র চারটি। এর মধ্যে আবার ভারতবর্ষে দুটি—রামায়ণ এবং মহাভারত। অন্য দুটি গ্রীসের—হোমারের লেখা ইলিয়াড এবং ওডিসি। রামায়ণের ভাষা সংস্কৃত, রচনা করেছিলেন বাল্মীকি। কিন্তু ঠিক কবে যে লেখা হয়েছিল, তা বলা কোনমতেই সম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন তিন হাজার বছর আগে, আবার অনেকের মতে তারও বেশী। সে যাইহোক, সপ্তকাণ্ড রামায়ণকে বলা হয় আদি মহাকাব্য। এবং বাল্মীকিকে বলা হয় আদিকবি। যুগ যুগ ধরে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক পরে নিজেদের ভাষায় বাল্মীকিকে অনুকরণ করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হিন্দীতে তুলসীদাস এবং বাংলায় কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করার মত।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম বনে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্যায়ভাবে সতীসাধ্বী সীতাকে হরণ করলেন রাবণ। বাধলো যুদ্ধ, সোনার লঙ্কা ছারখার হল পাপের ভারে। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি আর হনুমানের প্রভুভক্তি কখনো ভুলবার নয়। কিন্তু রামের চরিত্রের সঙ্গে কারুর তুলনা চলেনা। তুচ্ছ সুখভোগ নয়, বীরত্ব ও সত্যরক্ষা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। তিনি পুত্রের কর্তব্য করেছেন, স্বামীর কর্তব্য করেছেন, রাজার কর্তব্য করেছেন সমানতালে। যে সীতার জন্য এত কাণ্ড, তাঁকেও ত্যাগ করেছেন প্রজাদের মুখ চেয়ে। আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী রামচন্দ্রকে আদর্শ মহামানব বলে ভাবতেন।]

কবন্ধ বধ

দশরথ স্বর্গে গেছেন। রামের পাদুকা দুটি সামনে রেখে রাজ্য চালাচ্ছেন ভরত। রাম–সীতা–লক্ষ্মণ চিত্রকূট পার হয়ে দণ্ডকারণ্যে এসেছেন। তারপর দণ্ডকারণ্য ছেড়ে পৌঁচেছেন পঞ্চবটী। বিপদ ওঁত পেতে ছিল এখানেই। একদিন মায়ামৃগের পেছনে ধাওয়া করলেন রাম। দাদার খোঁজে লক্ষ্মণ। এই সুযোগে সীতাহরণ করলেন ছদ্মবেশী রাবণ।

সীতাকে হারিয়ে বড় কাতর হলেন রাম। পৃথিবীটাই যেন তাঁর কাছে শূন্য। তিনি নদী পাহাড় পশু পাখী গাছ সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কে দেবে উত্তর ? তিনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত। ভাবতে থাকলেন—হয়তো বা সীতা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে, ভয় দেখাচ্ছে, অথবা সরোবরে তুলতে গেছে পদ্মফুল ! সে কি বেঁচে আছে, নাকি রাক্ষসেরা রক্ত চুষে খেয়েছে ?

রামের অবস্থা প্রায় পাগলের মত। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা জানান লক্ষ্মণ। ঘুরতে ঘুরতে দুজনে গভীর বনে ঢুকলেন। পাহাড়ের গুহায় গুহায় জমাট অন্ধকার ঠাসা। হঠাৎ বিকট শব্দে চারদিকে যেন কেঁপে উঠল। হাতে খড়্গ তুলে নিলেন রাম। কাঁধে তীর–ধনুক। সতর্ক হলেন।

* * *

দেখা গেল, ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস তেড়ে আসছে তাঁদের দিকে। আঁতকে উঠার মত চেহারা। মাথামুণ্ডু নেই, ঘাড়–গর্দানও নেই। আগাগোড়া কবন্ধ। তার পেটের মধ্যেই মুখ। তাতে একটামাত্র চোখ জ্বলছে আগুনের ভাঁটার মত। ইয়া বড় বড় দাঁত। বিরাট লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে শিকার তুলে নেয়। যে কোন জন্তু–জানোয়ার টপাটপ গিলে ফেলে। ক্ষিদে না থাকলেও পিষে মারে। অসম্ভব গায়ের জোর। হুংকার শুনলে পিলে চমকে যায়।

সহসা রাম–লক্ষণকে জড়িয়ে ধরল কবন্ধ রাক্ষস। কী প্রচণ্ড চাপ ! দম বন্ধ হবার অবস্থা। ছাড়িয়ে নেওয়া কষ্টকর। রাম সাহস হারাননি। লক্ষ্মণ কিন্তু দারুণ ভয় পেলেন। ছটফট করতে করতে দাদাকে বললেন ঃ আমার ভাগ্যে যা আছে ঘটুক। আপনি এখুনি পালান। বৌদি এবং রাজত্ব উদ্ধার করার পর কখনো যদি আমার কথা মনে পড়ে, তাতেই আমি ধন্য।

রাম এতটুকুও অধীর হলেন না। তাঁর মনের জোর প্রবল। বললেন ঃ ভাই লক্ষ্মণ, ভুলে যেও না ক্ষত্রিয়কুলে তোমার জন্ম। তুমিও বীর। শত্রুকে মোকাবিলা করতে হবে আমাদেরই। এখন লড়াই করাই আমাদের কাজ। মিছামিছি হা–হুতাশ করে লাভ কি ?

কবন্ধ রাক্ষস তখন বিরাট হাঁ করে দুভাইকে গিলতে চেষ্টা করছিল। খনখনে সুরে বলছিল ঃ হাঁউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। কী মজা, কী মজা, হাঁড় মাংস চিঁবিয়ে চিঁবিয়ে খাঁব।

রাম ভাবলেন, চটপট কাজ সেরে নেওয়া ভাল। সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না।

রাজা দশরথের সাধ—বড় ছেলে রামকেই তিনি যুবরাজ বানাবেন। তাছাড়া এটাই তো নিয়ম, এটাই তো রীতি। অভিষেকের তোড়জোড় সম্পূর্ণ। মেজরাণী কৈকেয়ীর কিন্তু অন্যরকম ইচ্ছা। একেবারে শেষ সময়ে বাগড়া দিয়ে বসলেন।

উৎসবের আলো নিভে গেল। থামল নাচ গান বাজনা। তার বদলে শোকের ছায়া নেমে এল। দশরথ জ্ঞান হারালেন। বড়রাণী কৌশল্যা কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলালেন। প্রজারা পর্যন্ত হাহাকার করে উঠল।

তবুও রামচন্দ্র বনবাসে চললেন। চৌদ্দটা বছর কাটাতে হবে সেখানেই। রাজত্বও হাতছাড়া হল। পড়ে রইল আমোদ আহ্লাদ সুখ। বেছে নিলেন দুঃখ কষ্ট বিপদ। ফিরেও তাকালেন না। বাবা যে কথা দিয়েছেন একবার, ছেলেকে তা মেনে চলতেই হবে। সিংহাসনের চাইতেও কথার দাম অনেক বেশী।

এদিকে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে চাইতেন না সীতা। দাদাকেও একাকী যেতে দিলেন না লক্ষ্মণ। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন সাথে সাথে। কারুর নিষেধ শুনলেন না। রাম অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তারপর হাল ছেড়ে দিলেন। নাইবা থাকল রাজবাড়ীর আরাম, ঝকমকে পোষাক, ভারী ভারী গয়না! কিন্তু মনের শান্তি তো কম নয়! অরণ্যের সৌন্দর্য তাঁরা দু'চোখ ভরে দেখলেন।

কেটে যাচ্ছে মাসের পর মাস। মাখামাখি আনন্দ আর বিষাদ

যত দেরী হবে, রাক্ষসের তত সুবিধা। বুদ্ধিমানেরা প্রথমে আঘাত হানে। শত্রু-পক্ষকে তৈরী হবার সুযোগ দেয় না। কিন্তু এর হাতে যে একটাও অস্ত্র নেই। নিরস্ত্রকে বধ করা আবার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।

রাম কবন্ধ রাক্ষসের উপর খাঁড়ার ঘা মারলেন। তার দুটি হাতই ছেঁটে ফেললেন। মাটিতে রক্তের স্রোত বইল। অনেকক্ষণ ধরে গর্জন করল রাক্ষস। তারপর ঢলে পড়ল।

লক্ষ্মণ প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কে? তোমার এইরকম চেহারা কেন?

কবন্ধ উত্তর দিল ঃ আমি দানবের ছেলে। আমার নাম দনু। এককালে আমার চেহারা ভারি সুন্দর ছিল। কিন্তু কুৎসিত রাক্ষস সেজে আমি মুনিঋষিদের ভয় দেখাতাম। ফলমূল কেড়ে খেতাম। তাঁদের

অভিশাপেই আমার এমন দশা। দেমাকও বেড়েছিল। ধরাকে সরা জ্ঞান করতাম। এমনকি ইন্দ্রের সাথেও যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। তারপর বজ্রের আঘাত নেমে এল। পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল মাথা। হাঁটু দু'খানা দুমড়ে মুচড়ে চুরমার।

কবন্ধ আরো অনুরোধ জানাল ঃ তোমাদের দেখা পেয়েছি, এ আমার মস্তবড় সৌভাগ্য। এখন কিছু শুকনো কাঠ জোগাড় কর। গর্ত খোঁড়, আর আমাকে আগুনে পোড়াও। তবেই আমি শাপমুক্ত হব। ফিরে পাব আগের রূপ।

তাই করা হল। চিতার আগুন থেকে আকাশে উঠে গেলেন দনু। চড়ে বসলেন হাঁসে টানা সোনার রথে। কী মহান মূর্তি, কী মধুর কণ্ঠস্বর! রাম-লক্ষ্মণকে তিনি উপদেশ দিলেন ঃ তোমরা বিপন্ন। তোমাদের দুর্দশার সীমা নেই। এমন কোন লোকের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব করা উচিত, যেও বিপদে পড়েছে। যাও তাড়াতাড়ি সুগ্রীবের সাথে মিতালি পাতাও। বানর দলের সর্দার বলে তাকে অবহেলা করো না। সীতা-উদ্ধারে সে সহায় হবে। তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হোক!

[মহাভারত ॥ মহাভারত রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। এতে রয়েছে আঠারোটি পর্ব এবং লক্ষাধিক শ্লোক। পৃথিবীতে এত বিশাল গ্রন্থ আর নেই। সংস্কৃত ভাষায় লেখা। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রায় তিন হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল এই মহাকাব্য। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলার গল্প পেয়েছিলেন এখান থেকে। ব্যাসকে অনুসরণ করে বাংলাভাষায় অনেকে মহাভারত লিখেছেন। এদের মধ্যে কাশীরাম দাসের নাম সকলের আগে মনে পড়বে।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কত সাহিত্যিক কত বই লিখেছেন বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারত যত প্রিয়, এমনটি আর কোন বই নয়। কত অসংখ্য বিচিত্র বিচিত্র গল্প ঢুকে আছে এর ভেতর। মহাভারতের মূল অংশ কুরু-পাণ্ডবের কথা। যুধিষ্ঠির ছিলেন ধার্মিক, ভীম বলবান এবং অর্জুন বীর। কৃষ্ণ ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। ভীষ্ম ছিলেন ত্যাগী, ধৃতরাষ্ট্র স্নেহে অন্ধ এবং দুর্যোধন লোভী। কর্ণ ভাগ্যের হাতে বারবার মার খেয়েছেন। নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে গান্ধারী, কুন্তী ও দ্রৌপদী সকলের নজর কেড়েছেন। জীবনের সমস্তদিকে যদি আমরা শিক্ষা ও উপদেশ পেতে চাই, তাহলে মহাভারত পাঠ করা অবশ্য উচিত।]

মহাপ্রস্থানের পথে

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ। পাণ্ডবেরা জয়ী। হেরে গেছেন কৌরবেরা। দুর্যোধন আর তাঁর ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই। প্রাণ হারিয়েছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ। কৃষ্ণের ভাগনে আর সুভদ্রার ছেলে অভিমন্যু, কতটুকুই বা তার বয়েস, সেও মারা পড়ল। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব কতজনের জীবন চলে গেছে।

যুধিষ্ঠির মনে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। তবুও সিংহাসনে বসলেন। রাজত্ব চালালেন। প্রজাদের ভাল-মন্দের দিকে তাকালেন। পাণ্ডবদের এত সুখ। কিন্তু একটা বেদনা যেন চিন চিন করে বুকের ভেতর জেগে উঠছিল।

একদিন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী বনে চলে গেলেন। মরণকে ডেকে নিলেন সেখানেই। তারপর খবর পাওয়া গেল, কৃষ্ণ ও বলরাম দেহত্যাগ করেছেন। এমনকি গোটা যাদব বংশটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বারকাপুরী একেবারে ছারখার।

যুধিষ্ঠির ছিলেন হস্তিনাপুরে। তিনি নিজের মনটাকে ঠিক করে ফেললেন। ভাইদের সাথে
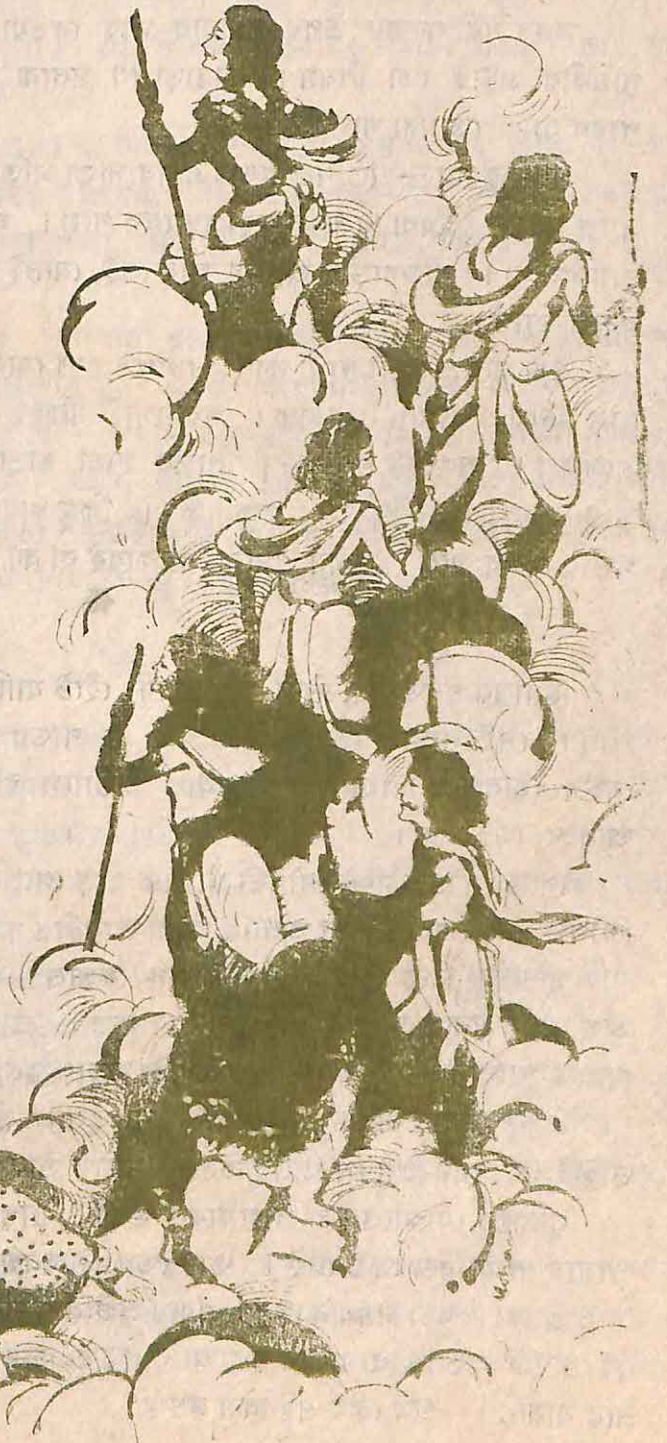
আলোচনা করলেন। সকলে বললেনঃ মহাকালকে কেউ এড়িয়ে যেতে পারে না। একদিন না একদিন সবকিছুর বিনাশ হয়।

তখন পরীক্ষিতের উপর রাজ্যের ভার দেওয়া হল। যুধিষ্ঠির সান্ত্বনা জানালেনঃ পৃথিবীর এটাই তো নিয়ম। তাছাড়া যে মনকে বেঁধে ফেলেছি, তাকে আর ফেরাতে পারব না। তোমরা শান্ত হও।

সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে পঞ্চপাণ্ডব এবার সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়লেন। দ্রৌপদীও তাঁদের সাথে সাথে। তাঁরা চলেছেন মহাপ্রস্থানের পথে। যতদূর চোখ যায়, এগোবেন। কোথাও থামবেন না। রাজবাড়ীর আরাম আর নেই, যেচেই নিয়েছেন দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা। ভোগের বদলে ত্যাগ।

ওঁরা সকলে দামী দামী কাপড়-চোপড় খুলে রেখেছেন। পরেছেন তুচ্ছ বল্কল। গাছের ছাল দিয়ে বানানো পোষাক। গয়নাগাটি কিছুই আনেননি সঙ্গে। সবই দান করে এসেছেন। অর্জুনই শুধু দুটি জিনিসের মায়া ছাড়তে পারেননি। নিজের চওড়া কাঁধে ঝুলিয়েছেন গাণ্ডীব ধনু আর অক্ষয় তূণ। কিন্তু হায়, খানিক পরে তাও ছুঁড়ে দিলেন নদির গভীর নিথর জলে। এখন এসবের দরকারই বা কী ?

✽ ✽ ✽

হিমালয় পর্বতমালা চিরে ছটি প্রাণী হেঁটে যাচ্ছিলেন। পেছনে অবশ্যি আরো একটি জীব। সেটি সামান্য কুকুর। দ্রৌপদী ও পাণ্ডব ভাইদের মনে ছিটেফোঁটা চিন্তাভাবনা নেই। মুনিঋষিরা যেমন করে যোগ অভ্যাসে বসেন, তাঁদের চলার ভঙ্গীটাই যেন অবিকল সেইরকম।

যেতে যেতে হঠাৎই দ্রৌপদী মাটিতে পড়ে গেলেন। ভীম কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেনঃ দ্রৌপদী তো কখনও কোন অন্যায় অধর্ম করেনি! তবু তার এই দশা কেন ?

যুধিষ্ঠির কিন্তু একবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন না। শুধু জবাব দিলেনঃ বরাবরই অর্জুনের দিকে ওর একটা আলাদা টান ছিল। আমাদের পাঁচ ভাইকে ঠিক সমান চোখে দেখতে পারেনি। নিক্তির ওজনে কিছুটা তফাৎ ছিলই। এখন তার ফলভোগ করতে হবে।

একটু বাদে সহদেবের একই দশা হল। ভীম শুধোলেনঃ আমাদের এই ছোট ভাইটি সব সময় আদেশ পালন করত। তবে তার এই অবস্থা কেন ?

যুধিষ্ঠির বোঝালেনঃ সহদেবের একটা চাপা অহঙ্কার ছিল। মনে মনে ভাবত, আমার চেয়ে বিজ্ঞ কেউ নেই। তাই তো এই রকম ঘটল।

আরো কিছুটা সময় কাটল। এবার লুটিয়ে পড়লেন নকুল। ভীমের একই রকম প্রশ্নঃ এই ভাইটি যেভাবে আমাদের যত্ন আত্তি করত, তার তুলনা ছিলনা। ধর্ম থেকেও কখনো সরে যায়নি! তবে কেন এইরকম হল ?

যুধিষ্ঠির জানালেন ঃ নকুলের একটা গর্ব ছিল। ধারণা করত, ও-ই বুঝি সবচেয়ে রূপবান। সেজন্য এই পরিণাম।

এইসব দেখে অর্জুন খুব শোক পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও ঢলে পড়লেন ধুলোয়। আর উঠলেন না। ভীমের জিজ্ঞাসা ঃ যে জীবনে একবারও মিথ্যা কথা বলেনি, তার ভাগ্যে এরকম ঘটল কেন ?

যুধিষ্ঠিরের গলা এতটুকু কাঁপল না। যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে উত্তর দিলেন ঃ অর্জুনেরও কম দম্ভ ছিল না। সমস্ত শত্রুদের নাকি একদিনেই মেরে ফেলবে, এমন কথা বলত। কিন্তু তা পারল ? তাছাড়া অন্য সেনাপতিদেরও অবজ্ঞা করত। এটাও তো এক ধরণের পাপ !

অনেকটা সময় গড়িয়ে গেল। সবশেষে শুয়ে পড়লেন ভীম। উঠে দাঁড়ানোর শক্তি আর নেই। একটু পরে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। তারি মধ্যে কোনরকমে বললেন : মহারাজ, আপনি তো আমায় কত ভালবাসতেন। কি দোষ করেছি ? আমারই বা পতন কেন ?

যুধিষ্ঠির কেমন যেন নিস্পৃহ। তিনি ব্যাখ্যা করলেন : তুমি ছিলে পেটুক-সর্বস্ব। তার উপর অসম্ভব রকমের দেমাকী। বড়াই করে বলতে, জগতে তোমার মত বলবান কেউ নেই। নিজেকে যে বড় করে দেখে, সে-ই তো সবচেয়ে মুর্খ।

* * *

যুধিষ্ঠির সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। একবারের জন্যও পেছন ফিরে তাকালেন না। কুকুরটিও তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছিল। ঠিক এমনি সময়ে আকাশ থেকে নেমে এল সোনার রথ। দেবরাজ ইন্দ্র ডাকলেন : যুধিষ্ঠির, তুমি এই রথে ওঠ।

যুধিষ্ঠির ধরা গলায় বললেন : আমার চার ভাই, আমার স্ত্রী পড়ে রয়েছে এখানে। ওদের ফেলে রেখে আমি একলা কি করে যাই ?

ইন্দ্র বললেন : মৃত্যুর পর ওরা স্বর্গে পৌঁছে গেছে। তুমিই একমাত্র সশরীরে স্বর্গে যেতে পার। সেখানেই ওদের দেখতে পাবে।

এবার যুধিষ্ঠির জানালেন : এই কুকুরটি আমার সঙ্গে এতটা পথ এসেছে। হতে পারে সামান্য জীব, তবুও আমার ভক্ত। একেও আপনি স্বর্গে যাবার অনুমতি দিন।

ইন্দ্র বাধা দিলেন। বললেন : কুকুর সবকিছু নোংরা করে। ওদের স্বর্গে যাবার অধিকার নেই। ওর কথা ভুলে যাও। তুমি একাই স্বর্গে চল।

যুধিষ্ঠির দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : আমার স্ত্রী বা ভাইরা যতক্ষণ বেঁচে ছিল, ততক্ষণ ওদের ছেড়ে যাইনি। কিন্তু ওদের বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার নেই। তাই ওদের কথা ভাবছি না। কিন্তু এই কুকুরটি আগাগোড়া আমার উপর ভরসা করে আছে। নিজের

সুখের জন্য একে ছেড়ে যাব না। জীবন যদি চলে যায়, তাও মেনে নেব। তবু যে অসহায় আর দুর্বল, তাকে রক্ষা করাই আমার ব্রত।

তখনই আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল। কুকুরটি অপরূপ মূর্তি ধরল। ভেসে এল দেবতার
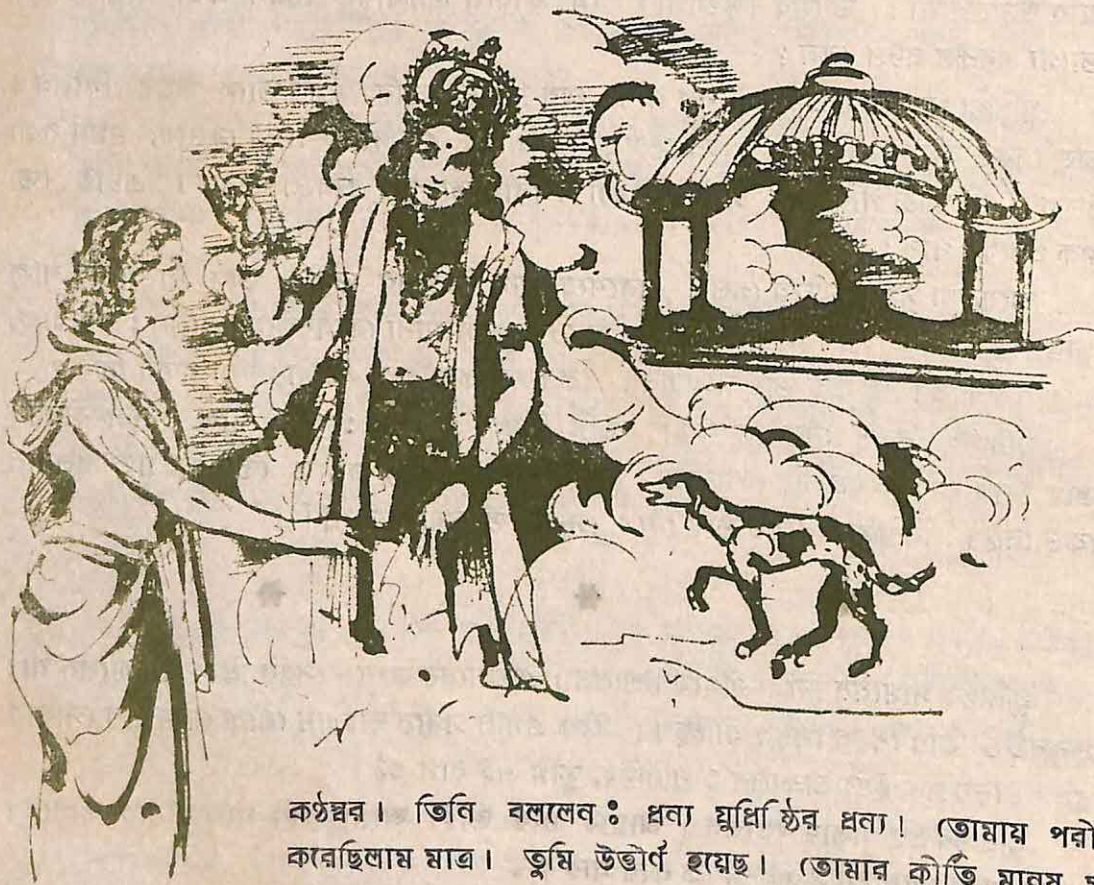
কণ্ঠস্বর। তিনি বললেন: ধন্য যুধিষ্ঠির ধন্য! তোমায় পরীক্ষা করেছিলাম মাত্র। তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার কীর্তি মানুষ মনে রাখবে। এত দয়া, এত ভালবাসা দেবতাদের মধ্যেও পাওয়া যায়না। সমবেদনা আর সহানুভূতি সব থেকে বড় পুণ্য। তুমি পুণ্যবান। এস, তোমার জন্য স্বর্গের দরজা খুলে দিচ্ছি। তোমার স্পর্শ পেয়ে স্বর্গও পবিত্র হোক।

[গ্রীক পুরাতনী ।। প্রাচীন ইউরোপে গ্রীসের কদর সবচাইতে বেশী। বলতে গেলে, সভ্যতার মশাল তাঁরাই সবার আগে জ্বালিয়েছিল। জীবনের সমস্তদিকে তারা দারুণ উন্নতি ঘটিয়েছিল। শুধু ইউরোপ নয়, গোটা পৃথিবী গ্রীসকে এজন্য মনে রেখেছে। একদা ওখানে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। তবে এথেন্স আর স্পার্টার নামডাক অন্যদের ছাড়িয়ে যায়। ওরা ছিল বীরের জাত। কোথাও কোথাও অসুস্থ আর দুর্বল শিশুকে বাঁচিয়ে রাখা হতনা। ইতিহাসের পাতায় চিরকাল লেখা থাকবে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডারের কাহিনী। গ্রীসদেশেই জন্মেছিলেন হোমারের মত মহাকবি, ঈশপের মত গল্পকার, সোফোক্লেসের মত নাট্য-রচয়িতা, ডেমোস্থেনিসের মত বাগ্মী, সক্রেটিসের মত দার্শনিক এবং অ্যারিস্টোটলের মত পণ্ডিত। এঁদের নিয়ে আজো আমরা গর্ব করি। শিল্পী এবং কারিগরেরা বানিয়েছিল বড় বড় প্রাসাদ, আর সুন্দর সুন্দর শ্বেত পাথরের মূর্তি। একালেও আমরা অবাক হয়ে দেখি।

পুরাকালে গ্রীসদেশের মানুষেরা মূর্তিপূজো করত। হিন্দুদের যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, ওদের তেমনি জিয়াস। তাঁর মাথায় ওক পাতার মুকুট, হাতে বজ্রদণ্ড। পাশে অপেক্ষা করত বিরাট এক ঈগলপাখী। মিজাভা হলেন জ্ঞানবিজ্ঞানের দেবী। তিনি প্রায়ই যুদ্ধের সাজে সেজে থাকতেন। পবিত্র ওলিভ গাছ তাঁর খুব প্রিয়। এ্যাপোলো আর ভেনাসও নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখতে পাই মানুষ যত বলবান হোক না কেন, তাদের ভাগ্যের সুতো ধরা আছে দেবদেবীর হাতে। গ্রীকপুরাণে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গল্প ছড়িয়ে রয়েছে।]

মিডাসের স্বর্ণপিপাসা

রাজা মিডাসের নামডাক গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চাইতে ধনী কেউ ছিলনা সেসময়। কত সোনাদানা, কত হীরে জহরৎ। এসবের যেন শেষ নেই।

তবুও মিডাস মনে শান্তি খুঁজে পেতেন না। তিনি ছিলেন লোভী। যত পেতেন, ততো চাইতেন। চাওয়ার আর বিরাম নেই। কী করে আরো বড়লোক হওয়া যায়, সেই চেষ্টা করতেন।

মিডাসের বরাতটাও ভাল ছিল। স্বর্গের কোন এক দেবতার নেক নজরে পড়ে যান তিনি। দেবতা বেজায় খুশী হয়েছিলেন। বর দিতে চাইলেন। বললেন: তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে তো বল। আমি পূরণ করে দেব।

রাজা মিডাসকে আর ধরে কে? এ যে হাতে চাঁদ পাওয়ার মত অবস্থা। মুখ ফুটে জানালেন: আমি যা কিছু ছোঁব, তা যেন সোনা হয়ে যায়।

দেবতা হাসলেন। শুধু বললেন: বেশ, তাই হোক!

তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন দেবতা। মিডাস বাড়ীর পথ ধরলেন। ভাবলেন—যে বর পাওয়া গেছে, এখুনি একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। ডাল ভেঙে ফেললেন। অমনি সেটা সোনা হয়ে গেল চোখের পলকে।

আনন্দের চোটে মিডাস লাফাতে থাকলেন। এ যে মহা আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁর যেন তর সইছিল না। যত ফল আর ফুল দোল খাচ্ছিল, সবগুলোতে হাত ছোঁয়ালেন। সোনায় সোনায় ভরে গেল। বস্তার পর বস্তা বোঝাই হল। চাকর-বাকরদেরও বইতে কষ্ট হচ্ছিল। মিডাস এখন মরীয়া। সোনার ভাঁড়ার বাড়িয়ে চললেন। সোনার পিপাসা তবু মিটছিল না।

মিডাসের একটি প্রিয় ঘোড়া ছিল। তারই ওপর চেপে বসলেন তিনি। নিমেষের মধ্যে সেটিও সোনা হয়ে গেল। দৌড়ানো তো দূরের কথা, নড়তে চড়তেও পারল না। আর পারবেই বা কি করে? ঘোড়াটার তখন প্রাণ নেই। শুধু সোনার তাল।

মিডাসের একটু দুঃখ হল ঠিকই। কিন্তু সুখও কম নয়। ঘোড়াটা মরে গেছে, এই যা। তার বদলে পাওয়া গেছে কত সোনা! মিডাস হিসেব কষে দেখলেন। ঘোড়ার থেকে সোনার দাম বেশী! অতএব, লাভ হয়েছে নিশ্চয়।

রাজবাড়ীতে ঢুকে মিডাস সব থামগুলো ছুঁলেন। সবই তখন সোনা। মিডাসের ফুর্তি দেখে কে? তিনি তখন দু'হাত তুলে নাচছেন। হাজার হাজার মণ সোনার মালিক। তাঁকে টেক্কা দেওয়ার কেউ নেই। গর্বে ছাতি ফুলে উঠল।

শুধু একটুখানি অস্বস্তি। তাঁর পরণের কাপড়-চোপড় সোনা হয়ে গেছল প্রথম থেকে। বড্ড ভারী ভারী। তাই বিরক্তি লাগছিল। কষ্ট হচ্ছিল টানতে। তাছাড়া বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। ঘরের মধ্যে পরিপাটি বিছানা পাতা। সাদা ধবধবে। পাখীর পালকের মত নরম। মিডাস শুয়ে পড়লেন তার উপর। আরে, এ কী! বিছানাটাও সোনা হয়ে গেল। হলদেটে শক্ত শক্ত জিনিস। মিডাসের চোখদু'টি ছানাবড়া হল। ঘুম চুলোয় গেছে। সামান্য বিশ্রামটুকুও পেলেন না।

মিডাসের খুব ক্ষিদে পাচ্ছিল। সকাল থেকে কিছু খাননি। নাড়িভুঁড়ি চুঁয়ে গেছে। সামনেই থরে থরে খাবার-দাবার সাজানো। হরেকরকম রুটি-মাংস-সবজি-মিঠাই। মিডাস খেতে গেলেন। কিন্তু হায়! যেমনি হাত ছোঁয়ালেন, অমনি সবকিছু সোনা হয়ে গেল।

এতক্ষণে মিডাসের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। তিনি গা ধুতে চললেন। নামলেন চৌবাচ্চার জলে। সেই শীতল জলও বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে। মিডাস দেখলেন, সোনার বরফ ছাড়া সেখানে অন্য কিছু নেই।

মিডাস আঁতকে উঠলেন ভয়ে। তিনি শিউরে উঠছিলেন। কী করবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই। ঘুমানো পর্যন্ত নেই। জীবনে যদি শান্তি না আসে, সোনার দামই বা কতটুকু? কী হবে তাল তাল সোনা নিয়ে? কী দরকার এর?

মিডাস চুপটি করে বসে থাকলেন। খুবই মনমরা তিনি। তাঁর ছোট্ট মেয়েটি ঘরে ঢুকল এই সময়। দাঁড়াল বাবার কাছে। মিডাসের চোখ জুড়াল। ছোট মেয়েটিকে তিনি বড় ভালবাসতেন। মিডাসের আদর করার ইচ্ছে হল। কোলের মধ্যে মেয়েকে টেনে

নিলেন। এবার যা বাকী ছিল, তাই-ই ঘটল। মেয়েটির প্রাণ বেরিয়ে গেল। সে তখন সোনার একতাল পিণ্ড মাত্র।
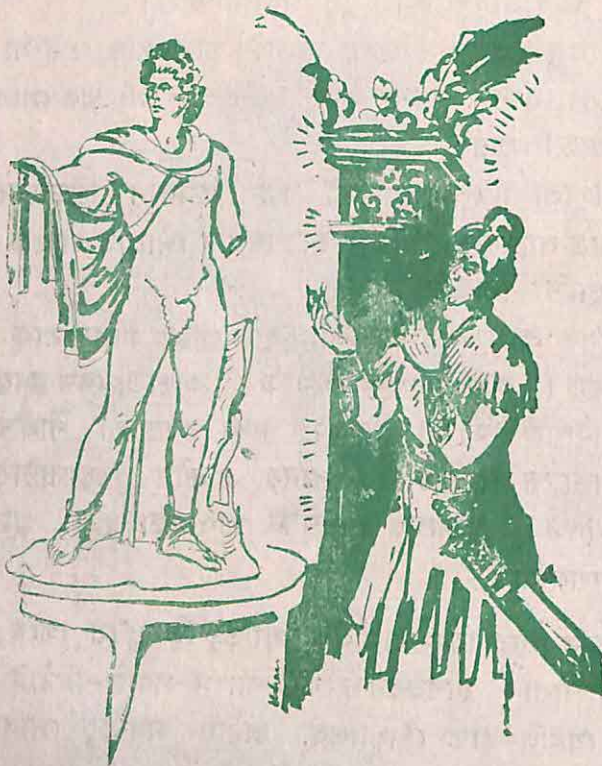
ডুকরে কেঁদে উঠলেন মিডাস। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। তিনি পাগলের মত কপাল চাপড়াতে থাকলেন। দৌড়ে গেলেন দেবতার মন্দিরে। মাথা ঠুকতে ঠুকতে বললেন ঃ তোমার বর তুমি ফিরিয়ে নাও ঠাকুর। আমার সাধ মিটে গেছে। এখন আমার মেয়েকে বাঁচাও। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত দিন কাটাতে চাই। তার বেশী আর চাই না।

মধুর হাসি উপহার দিলেন দেবতা। স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন ঃ পবিত্র নদীর জলে স্নান সেরে এস। তাহলে আগের জীবন ফিরে পাবে। অতিরিক্ত লোভ কখনো ভাল নয়। একথা বুঝতে পেরেছ দেখছি। সেজন্য খুশী হলাম। পৃথিবীতে সোনা খুবই দামী জিনিস। তবু সোনার পেছনে ছুটে বেড়ানো মূর্খামি মাত্র। এ ধরনের ফাঁদে পা বাড়ায় যারা, কোনদিন ভগবানের আশীর্বাদ তারা পায় না। পায় শুধু অভিশাপ।

সেরা সম্পদ

[বত্রিশ সিংহাসন ॥ সেকালের ভারতে বিক্রমাদিত্য ছিলেন সব চাইতে খ্যাতিমান রাজা। উজ্জয়িনী ছিল তাঁর রাজধানী। দেবরাজ ইন্দ্র একবার তাঁকে একটি অপূর্ব সুন্দর সিংহাসন উপহার দেন। বত্রিশটি পুতুল খোদাই করা ছিল এই সিংহাসনের নীচে। বিক্রমাদিত্যের জীবন শেষ হওয়ার পর দৈববাণী হল : 'এই সিংহাসন অতি পবিত্র। একে মাটির তলায় রেখে এস'। তারপর আপনা হতেই মাটির উপর মাটি চাপল। তৈরী হল বিশাল ধানক্ষেত। লোকেও ভুলে গেল সিংহাসনের কথা। অনেককাল বাদে ভোজরাজ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন, একটা টিবির উপর উঠে বসামাত্র যেকোন লোক খুব জ্ঞানী হয়ে পড়ে। টিবি থেকে নেমে এলে আবার আগেকার মত সাধারণ মানুষ। অবাক হলেন ভোজরাজ। তিনিই খুঁড়ে বার করলেন বিক্রমাদিত্যের সেই সিংহাসন।

সিংহাসনটিকে রাজপুরীতে নিয়ে আসা হল। ভোজরাজ যেই সিংহাসনে বসতে যাবেন, অমনি একটি পুতুল মানুষের গলায় কথা আরম্ভ করল। বলল : 'আপনি কি বিক্রমাদিত্যের মত গুণী?' ভোজরাজ উত্তর দিলেন : 'হ্যাঁ'। পুতুলটি বলল : 'যারা পরের দোষ ধরে আর নিজের প্রশংসা করে, তারা আদপে ভদ্রলোকই নয়।' ভোজরাজ ভারী লজ্জা পেলেন। এরপর প্রতিদিনই এক একজন করে বত্রিশটি পুতুল গল্প বলতে থাকল। ঐ গল্পগুলিকে নিয়ে বত্রিশ সিংহাসন লেখা। আসল নাম 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা'। প্রায় সাতশো বছর, আগেকার বই, ভাষা সংস্কৃত। আসল লেখক কে—ক্ষেমংকর, বররুচি অথবা অন্য কেউ—সেকথা এখনো জানা যায়নি।]

শালিবাহন আগাগোড়া সমস্ত কথা শুনে নিলেন। এবং জট খুলে ফেললেন অতি সহজে। মুখে শুধু বললেন ঃ এ আর এমন কঠিন কাজ কি?

প্রথমে এগিয়ে এল বড় ছেলে। সে পেয়েছে মাটি। শালিবাহন বুঝিয়ে দিলেন ঃ তোমার বাবার যত জমি-জায়গা আছে, সেগুলো পাবে তুমি।

এর পর মেজ ছেলের পালা। তার কপালে জুটেছে খড়। শালিবাহন জানালেন ঃ তোমার বাবার খামারে যত ধান, গম আর ফসল রয়েছে, তা তুমি নিও।

সবশেষে সেজ আর ছোটছেলে। একজনের বরাতে কয়লা, অন্যজনের হাড়। শালিবাহন বললেন ঃ কয়লা যে পেয়েছে, সে নেবে যত সোনাদানা আর গয়নাগাটি। হাড়ের মানে অবশ্যি অন্যরকম। গরু-ছাগল ভেড়া-মোষ যা কিছু জন্তু-জানোয়ার আছে, এসব দখল করবে সে।

ছেলেরা সকলে খুশীমনে বাড়ী ফিরে গেল।

* * *

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কানে এ কথা ভেসে এল। তিনি খুব প্রশংসা করলেন। শালিবাহনকে ডেকে পাঠালেন নিজের রাজসভায়।

শালিবাহন উত্তর পাঠালেন ঃ রাজা ডাকলেই যেতে হবে নাকি? ওঁর যদি দরকার থাকে, তাহলে আমার কাছে আসতে বল।

এই স্পর্ধা দেখে বিক্রমাদিত্য দারুণ চটে গেলেন। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে পেঁাছে গেলেন শালিবাহনের গাঁয়ে। শেষবারের মত দূত পাঠালেন। শালিবাহন জবাব দিলেন ঃ আমাদের দেখা হবে যুদ্ধক্ষেত্রে, দরবারে নয়।

তুমুল লড়াই আরম্ভ হল। কুমোরের বাড়ী থেকে শালিবাহন আনলেন মাটির তৈরী হাতি, ঘোড়া, রথ। মন্ত্র পড়ে সেগুলোকে জ্যান্ত করে দিলেন তিনি। তবুও বিক্রমাদিত্য জিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শালিবাহন আরো একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটালেন। দেবতাকে তুষ্ট করলেন, পেঁাছে গেল লক্ষ লক্ষ সাপ। সাপের কামড়ে রাজার সৈন্যরা মারা পড়ল। বিক্রমাদিত্য এখন অসহায়।

বিক্রমাদিত্য একাকী রাজধানীতে ফিরে এলেন। আরম্ভ করলেন সবচেয়ে কঠিন তপস্যা। গলা পর্যন্ত ডুবে থাকলেন আর পাক্কা ন'বছরের স্তোত্র পাঠ করলেন।

অবশেষে বাসুকিনাগ দেখা দিলেন। বললেন ঃ কি বর চাও বল।

বিক্রমাদিত্য বললেন ঃ হে দেব, আমার প্রার্থনা শুনুন। সাপের কামড়ে যারা মারা গেছে, আমি তাদের বাঁচাতে চাই।

বাসুকি অমৃতের একটি ভাঁড় রাজার হাতে তুলে দিলেন। গমগমে গলায় শুধু জানালেন ঃ এর এক ফোঁটা দিয়ে তুমি বহু মরা মানুষকে বাঁচাতে পারবে।

পুরন্দরপুরী শহরে এক ধনী সদাগর বাস করত। তার চারজন ছেলে। একদিন সদাগর বলল: আমি মারা গেলে তোমরা যে সবাই একসাথে থাকবে, এমন নাও হতে পারে। খাটের তলায় আমার সমস্ত ধনসম্পদ গচ্ছিত রাখলাম। প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছি। কথাটা মনে রেখো।

তারপর যথাসময়ে সদাগরের মৃত্যু হল। সত্যি সত্যি, কিছুদিনের মধ্যে ছেলেরা আলাদা হয়ে গেল। তখন ভাইয়েরা যুক্তি করল: বাবা যা রেখে গেছেন, এবারে মাটি খুঁড়ে বের করা যাক।

পাওয়া গেল একটা বড় ধরনের ভাঁড়। তার ভেতরে আবার চারটে ছোট ছোট কৌটো। এক একজনের নাম লেখা আবার সেগুলোর গায়ে। কৌটো খোলামাত্র কিন্তু সকলেরই চক্ষু চড়কগাছ। একটাতে মাটি, একটাতে খড়, অন্যদুটোতে আছে কয়লা আর হাড়।

ভাইয়েরা অনেক মাথা ঘামাল। কিন্তু বাবা যে কী বলতে চেয়েছেন, ব্যাপারটা একেবারেই পরিষ্কার হল না। এ যেন বিরাট এক ধাঁধা।

বহু দেশ ঘুরে বহু পণ্ডিতের কাছে তারা ধন্না দিল। কেউই সমাধান করতে পারলেন না। রহস্য যা ছিল, তাই থেকে গেল। ছেলেরা যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, তখন একদিন শালিবাহনের সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। শালিবাহন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান আর ধুরন্ধর।

বাসুকি নাগ অদৃশ্য হলেন, ঠিক যে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। রাজাও খুশী মনে রওনা হলেন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে। এখন তিনি নিশ্চিন্ত।

ঠিক এমনি সময় একজন ব্রাহ্মণ সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিক্রমাদিত্য জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমার প্রণাম নিন। আপনার কি কিছু বলার আছে ? যদি থাকে, দয়া করে তাড়াতাড়ি বলুন।

ব্রাহ্মণ জবাব দিলেন ঃ শুধু একটা জিনিস চাইতে এসেছি। যদি দেবেন বলে কথা দেন, তাহলেই জানাব। নইলে নয়।

হাসির রেখা ফুটে উঠল বিক্রমাদিত্যের মুখে। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি জানালেন ঃ বেশ, প্রতিজ্ঞা করছি। আমার কাছে যাঁরা চাইতে আসে, কোনদিনই তাঁদের ফেরাই না।

ব্রাহ্মণ বলে ফেললেন ঃ তাহলে ঐ অমৃতের ভাঁড়টি আমায় দিন।

বিক্রমাদিত্য চমকে উঠলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। বুঝে নিলেন, এ নিশ্চয় শালিবাহনেরই কারসাজি। তবু প্রতিজ্ঞা পালন ছাড়া অন্য পথ নেই। ব্রাহ্মণকে অমৃতের ভাঁড় দান করলেন আনন্দের সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ বললেন ঃ ধন্য মহারাজ, আপনি ধন্য। আপনার উদারতার কোন তুলনা নেই। আজ স্পষ্ট বুঝেছি—সাহস, ধৈর্য্য, ত্যাগ ও মহত্ব মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

[**শুকসপ্ততি ।।** অনেকবছর আগে চন্দ্রপুর শহরে বাস করত মদন। বণিকের ছেলে সে। তবু কোন কাজকর্মে তার মন ছিল না। আয়-উপায় করত না, শুধু এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত আর হৈ-হুল্লোড় নিয়ে মেতে থাকত। তার একটি শুকপাখী ছিল। পাখীটি জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান। শুকপাখী বলল: 'নিজের কর্তব্য যে পালন করে, তার মত ধার্মিক পৃথিবীতে কেউ নেই'। মদনের মন ঘুরে গেল। সে বেরিয়ে পড়ল বিদেশে, বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। মদনের স্ত্রীর নাম প্রভাবতী। প্রভাবতী এবার রোজই বাড়ীর বাইরে যাওয়ার ঝোঁক করত। শুকপাখী প্রতিদিন বলত একটি করে মজার মজার সব গল্প। গল্পের টানে প্রভাবতীর আর বাইরে যাওয়া হতনা। দেখতে দেখতে কেটে গেল সত্তরটা দিন। অবশেষে মদনও ফিরে এল বাড়ীতে। 'শুকসপ্ততি' ভরে উঠেছে এই সত্তরটা গল্প নিয়ে।

শুকসপ্ততি' লেখা হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়, প্রায় আটশ থেকে ন'শ বছর আগে। ঠিক কে যে লিখেছেন, তা বলা মুশকিল। কেউ বলেন—চিন্তামণি ভট্ট, আবার অন্যদের মতে—শ্বেতাম্বর জৈন। ভাষা খুবই সাদাসিধে, আর গল্প বলার ভঙ্গীটিও চমৎকার। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে মানুষ কিভাবে বিপদ-আপদ থেকে রেহাই পায়, সেই কথাগুলো বলা হয়েছে প্রতিটি গল্পে। বহুকাল আগে আরব-ইরান দেশে এর অনুবাদ করা হয়েছিল, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে]

বাঘ আর বাঘমারী

দেউলাখ্য গ্রামে এক রাজপুত্র বাস করত। তার নাম রাজসিংহ। রাজসিংহের স্ত্রী বড় ঝগড়াঝাটি করত! সেজন্য 'কলহপ্রিয়া' বলেই লোকে তাকে ডাকত।

একদিন স্বামীর সঙ্গে দারুণ ঝগড়া বাধিয়ে বসল কলহপ্রিয়া। আসলে তার স্বভাবটাই ছিল এইরকম। খিটিমিটি না হলে তার যেন সময় কাটত না। প্রথমটা সে মনের সুখে অনেক গালাগাল দিল। তারপর রাগের চোটে বাপের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। দু'ছেলেকে নিল সঙ্গে। তার তখন হিতাহিত জ্ঞান নেই।

প্রথমে শহরের চৌহদ্দি পেরোল। তারপর দেখা দিল গহন বন। একপাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাহাড়। চারিদিক কী নির্জন! অরণ্যের যেন শেষ নেই। লম্বা লম্বা সব গাছ। আম, জাম, তেঁতুল, কাঁঠাল— আরো কত কী। ডালপালা আর গাছ-গাছালি মিলে আটকে রেখেছে রোদ। তাই সকালবেলাতেই আবছা আবছা অন্ধকার।

কলহপ্রিয়ার হঠাৎ নজরে এল, একটা বড়সড় বাঘ ঘাপটি মেরে বসে আছে হাত কয়েক দূরে। মুখ থেকে বেরুচ্ছে গরগর শব্দ। মাটিতে আছাড় মারছে লেজ। চোখদু'টো জ্বলছে ঠিক ভাঁটার আগুনের মত। এখুনি সে লাফিয়ে পড়বে তাদের ঘাড়ে।

বিপদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কলহপ্রিয়া কিন্তু এতটুকুও ঘাবড়াল না। সে ছেলেদের গালে সজোরে চড় কষাল। তারপর চীৎকার করে বলল ঃ তোরা দুটোই হতভাগা। একলা একলা গোটা বাঘটাকে খাওয়ার জন্য ঝগড়া করছিস কেন? সামনে তো রয়েছে একটামাত্র বাঘ। আপাততঃ ওটাকেই ভাগ করে খেয়ে নে। পরে সময়মত আর একটার খোঁজ করব।

যে–ই না একথা শোনা, বাঘের আত্মারাম তখন খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম। ভয়ে সে অস্থির হয়ে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে ভাবল ঃ মেয়েটি নিশ্চয় কোন বাঘমারী। বাঘকে মেরে ফেলার মন্ত্র এর জানা। অতএব পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানই ভাল।

বাঘের আর তর সইল না। যেদিকে দুচোখ যায়, চোঁ চোঁ দৌড় লাগাল সেই দিকে।

* * *

একটা শেয়াল যাচ্ছিল বনপথ দিয়ে। সে দেখল, ঐ বাঘটা তীব্রগতিতে ছুটে পালাচ্ছে গভীর বনের ভেতরে। বাঘটার কোন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না। ভয়ে মুখ শুকিয়ে যেন এতটুকু।

প্রথমটা শেয়াল একটু অবাক হল। তারপর হাসতে হাসতে ভাবল ঃ এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার। বাঘকে দেখে সবাই ভয়ে পালায়। আজ উল্টো ঘটনা দেখছি।

শেয়াল হেঁকে বলল ঃ বলি ও বাঘমামা, আমার কথা শোন। আজ কি এমন ঘটেছে? তুমিই বা ভয়ে পালাচ্ছ কেন?

পশুদের ভেতর শেয়ালের বুদ্ধি সব চাইতে বেশী। তাই বাঘ একটুখানি থমকে দাঁড়াল। সব্বার আগে পেছনটা দেখে নিল সতর্কদৃষ্টিতে। মিনমিনে গলায় এবারে বাঘ জবাব দিল ঃ আরে ভাগনে, কোন গোপন জায়গায় এখুনি লুকিয়ে পড়। পুঁথিপত্রে যে বাঘমারীর কথা লেখা আছে, আজ নিজের চোখেই তাকে দেখলাম। একটু হলেই আমাকে মেরে ফেলছিল। কোনরকমে পালিয়ে এসেছি।

শেয়াল সমস্ত ঘটনাটা মন দিয়ে শুনল। তারপর খুব একচোট হেসে নিল। বললে ঃ মামাগো, মজার কথা শোনালে যা হোক। সামান্য মানুষকে তুমি ভয় পাবে কেন? মেয়েটি দেখছি খুবই সেয়ানা। চল, এখুনি ওর কাছে যাওয়া যাক। ওকে জব্দ না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

বাঘ আপত্তি জানাল ঃ ওরে বাবা, ওপথে আর পা বাড়াচ্ছি নে। ন্যাড়া বেলতলায় একবারই যায়, দুবার নয়।

শেয়াল আশ্বাস দিল ঃ বেশ তো, মেয়েটি যদি একবার হলেও তোমার দিকে চোখাচোখি করার সাহস পায়, তবে তুমি আমায় তখুনি মেরে ফেল। এই আমার সর্ত।

বাঘের কিন্তু-কিন্তু ভাব রয়েই গেছে। সে বলল ঃ ওরে ভাগনে, তুই তো প্রথমে কেটে পড়বি। আর আমি মারা পড়ব বাঘমারীর হাতে। তাহলে এইসব সর্তের কী-ই বা দাম ?

শেয়াল গম্ভীরকণ্ঠে বলল ঃ এতই যখন সন্দেহ, ঠিক আছে, তোমার নিজের গলায় আমাকে কষে বেঁধে রেখ। তাহলে তো আর তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না !

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অগত্যা বাঘ রাজী হয়ে গেল। শেয়ালকে বেঁধে ফেলা হল গলায়। তারপর গুটিগুটি পায়ে বাঘ চলল সেইখানে, যেখানে থেকে সে পালিয়ে এসেছিল একটু আগে।

গাছের তলায় কলহপ্রিয়া তখন বিশ্রাম নিচ্ছিল। ফুরফুর হাওয়া বইছে। এতটা পথ হাঁটার পর শরীরটা বড় ক্লান্ত। ছেলেদুটিও ঘুমিয়ে পড়েছে একপাশে। দূর থেকে বাঘ আর শেয়ালটাকে দেখতে পেল কলহপ্রিয়া। বুঝতে আর বাকী থাকল না, এবারে শেয়ালটাই যত নষ্টের গোড়া। বাঘকে সে-ই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

আঙ্গুল তুলে শাসাতে শাসাতে কলহপ্রিয়া বলল ঃ ওরে পাজী
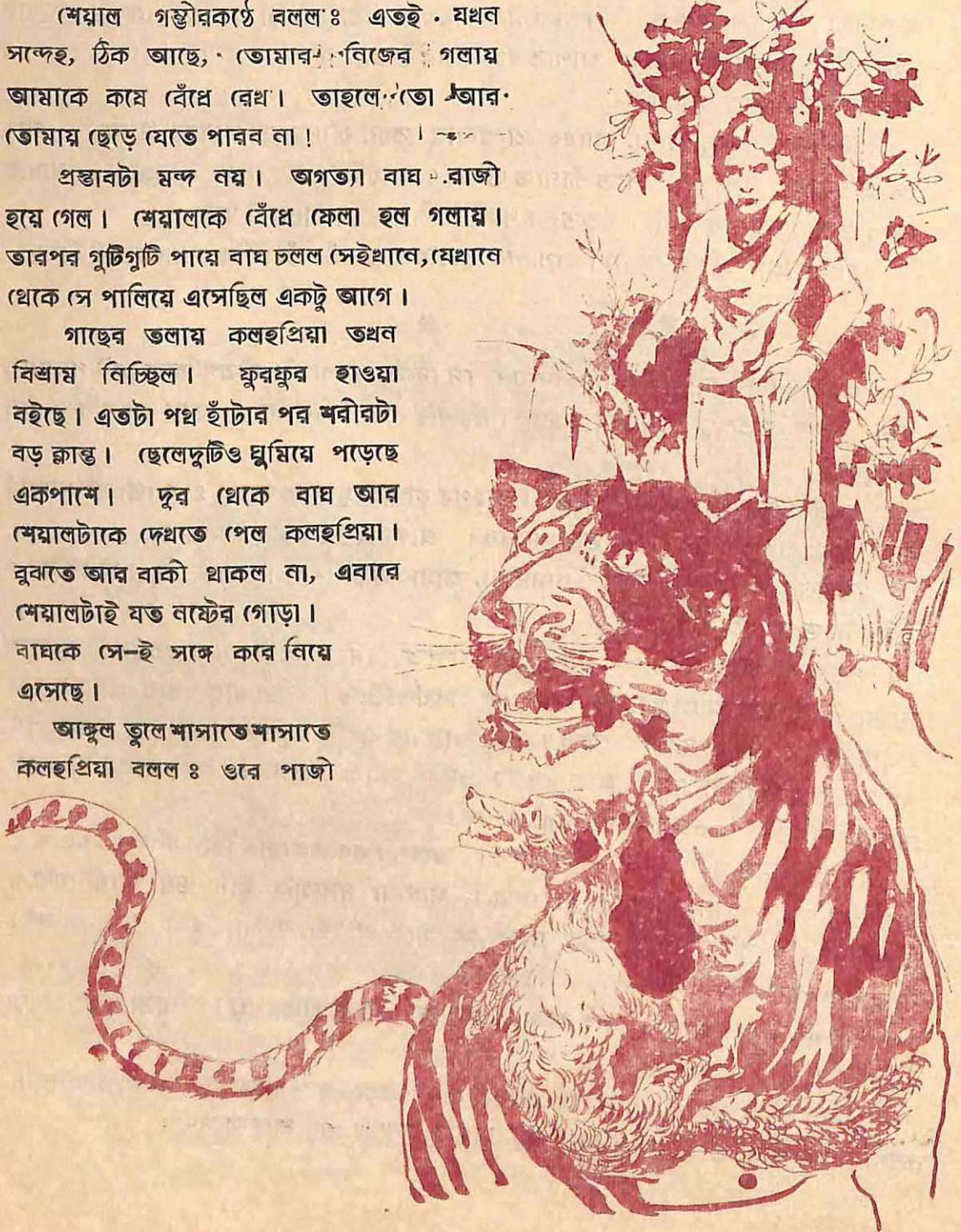
নচ্ছার হতচ্ছাড়া শেয়াল, তিনটে বাঘ ধরে আনার কথা দিয়েছিলি তুই। আজ কিনা এনেছিস একটা মোটে বাঘ ? তোদের দুটোকে কিভাবে জ্যান্ত পুঁতি, ভাল করে দেখ।

ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরল কলহপ্রিয়া। কিছুটা পথ তেড়ে এগিয়েও এল। বাঘের তখন পিলে চমকানোর অবস্থা। এতটুকুও কালবিলম্ব করল না। শেয়াল যেমন বাঁধা ছিল, তেমনটি ঝুলে রইল গলায়। বাঘ দৌড়চ্ছে, শুধুই দৌড়চ্ছে। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদীনালা পেরিয়ে, বনবাদাড় চিরে কোথায় যে পালাচ্ছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। ধনুকের থেকে ছিটকে তীর যেমন তীব্রবেগে ছুটে যায়, বাঘের তখন অবিকল সেই দশা।

* * *

বাঘ পালাচ্ছে বাঘমারীর ভয়ে। কিন্তু শেয়ালের দুর্দশা তার চাইতে বেশী। মাটিতে ঘষা লেগে তার অবস্থা কাহিল। শরীরের অনেকটা জায়গা কেটে যাচ্ছে। রক্ত পড়ছে ঝরঝর করে। আর একটু হলেই মারা পড়বে সে।

এখন ঠ্যালা সামলাবে কে, আর কি করে পাবে রেহাই ? কথায় তো বলে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। তাই এত দুঃখের মাঝখানেও শেয়াল হো হো করে হেসে উঠল।

বাঘ জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি হাসলে যে বড় ?

শেয়াল জবাব দিল ঃ এখন বুঝতে পেরেছি, ওর মত চালাক-চতুর মেয়ে ভূ-ভারতে কোথাও নেই। তোমার দয়ায় এতদূর এসেছি। কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছি। কিন্তু ভয় হয়, এই রক্তের দাগ দেখে সেই বাঘমারী যদি পেছন পেছন আসে। তাহলে মামা, দুজনে বাঁচব কেমন করে ?

বাঘের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। থতমত খেয়ে শুধু একবার বলল ঃ তুই ঠিকই বলেছিস। কথাটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

চটপট শেয়ালের বাঁধন খুলে ফেলা হল। তারপর বাঘ দৌড় লাগাল, যেদিকে দুচোখ যায় সেই দিকে। এদিকে মুক্তি পেয়ে শেয়ালও নিশ্চিন্ত বোধ করল।

একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে শেয়াল ভাবল ঃ শরীরের শক্তি কোনদিনই সবচাইতে বড় কথা নয়। মগজে বুদ্ধি যার আছে, সত্যিকারের বলবান সে।

[**উপনিষদ ॥** প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ হল তিনটি—বেদ, উপনিষদ এবং গীতা। উপনিষদ বেদের শেষ অংশ, তাই একে বলা হয় বেদান্ত। উপনিষদের সংখ্যা ১৮০। শঙ্করাচার্য বলেছেন—এর মধ্যে এগারোটি মহামূল্যবান। এগুলির নাম—ঈশ, কেন, কঠ, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সত্যকামের গল্পটি নেওয়া হয়েছে 'ছান্দোগ্য' উপনিষদ থেকে। পৃথিবীর সমস্ত পণ্ডিত উপনিষদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন। উপনিষদে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, তা হল হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ। জ্ঞানের তৃষ্ণার শেষ নেই, সেই রহস্য খোঁজার চেষ্টা করেছে উপনিষদ। প্রায় তিন হাজার বছর আগে উপনিষদ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন ঋষিগণ। অনেকসময় ছোট ছোট গল্প বলে কঠিন কথা সহজ করে তুলেছেন তাঁরা। উপনিষদের সামান্য অংশ বুঝলেও মানুষের মন অনেক উন্নত হয়। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম চালু করেছিলেন। সেখানেও উপনিষদকে জানানো হয়েছে সবচেয়ে বেশী সম্মান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু কবিতায় উপনিষদের ভাব ফুটে রয়েছে।]

জবালা ও সত্যকাম

সেকালেও ছিল লেখাড়ার চলন। ছাত্রদের কিন্তু থাকতে হত গুরুর আশ্রমে। তপোবনের সুন্দর পরিবেশ। তার উপর সরল আর সাদাসিধে জীবন। পরিশ্রমের অভ্যেসে কেটে যেত দিন এইভাবে মানুষ হত তারা। লেখাপড়াটা যে তপস্যা, মনে মনে বুঝত। গুরুর আদেশের চেয়ে বড় কিছু ছিল না।

ছোট্ট সত্যকামেরও সাধ জাগল। বিদ্যা ছাড়া মানুষের কতটুকুই বা দাম? অতএব, সে চলল গুরুর গৃহের দিকেই। তখনকার দিনে গৌতম ঋষিকে সবাই দারুণ শ্রদ্ধা করত। ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সুখ্যাতি। পড়ুয়ার দল ছুটে আসত দেশ বিদেশ থেকে। তাই সত্যকাম আর দেরী করল না। একদিন পৌঁছে গেল ঋষি গৌতমের আশ্রমে।

ঋষি গৌতম প্রশান্ত নয়নে নতুন ছাত্রটির দিকে তাকালেন। শুধোলেন ঃ তোমার নাম কি? তোমার বাবার নাম কি? তোমার গোত্র বা বংশ পরিচয় এবার বল।

সত্যকাম মহা ফাঁপরে পড়ল। সে নিজের নামটা উচ্চারণ করল ঠিকই। কিন্তু বাবার নাম আর বংশ পরিচয় কিছুই তো জানে না। তাই আমতা আমতা করল। মাথা নীচু রাখল। তার মুখ থেকে দুটি মাত্র শব্দ বেরিয়ে এল ঃ আমি জানিনা।

গৌতম একটুখানি অবাক হলেন। এমনটা তো কোন ছেলের বেলায় ঘটেনি। বাবার নাম জানে না, সে আবার কী? তবু মিষ্টি সুরে বললেন ঃ তোমার বাবার কাছ থেকেই জেনে এসো।

সত্যকাম কোনরকমে উত্তর দিল ঃ আমার বাবা নেই।

গৌতম এবার সহানুভূতি দেখালেন। বললেন ঃ আহা রে!

মুহূর্তমাত্র থেমে গৌতম আবার বললেন ঃ বেশ তো, তোমার মায়ের কাছ থেকেই জেনে এসো। এটা জানা দরকার।

এতক্ষণে সত্যকামের মুখে হাসি ফুটল। নিষ্পাপ চোখদুটি তুলে বলল ঃ হ্যাঁ গুরুদেব,

সে-ই ভাল হল। আমি যাব আর আসব। মায়ের কাছেই জেনে নেব আমার বাবার নাম। গোত্রের ইতিহাসও শুনব একই সাথে।

* * *

সত্যকাম বাড়ীতে পৌঁছল হাঁপাতে হাঁপাতে। তার মায়ের নাম জবালা। এসেই জড়িয়ে ধরল। কচি কচি গলায় জিজ্ঞেস করল ঃ মা, মাগো! আমার বাবার নাম কি? বংশ আর গোত্র পরিচয় কি?

জবালা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। চেয়ে থাকল আকাশের দিকে। দৃষ্টিটা কেমন যেন উদাস। ছেলের মাথায় হাত বুলাল আপন মনে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে বলল ঃ তোর কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারব না, সোনা মানিক আমার।

বিস্মিত সত্যকাম শুধাল ঃ কেন মা?

জবালা বলতে থাকল ঃ অভাবে পড়ে ঝিগিরি করে দিন কাটিয়েছি। বহু জায়গা ঘুরেছি। আমার কোল আলো করে তুই এসেছিস সেসময়। কে যে তোর বাবা তাইতো জানি না। তোর বংশ পরিচয় দিতে পারব না।

জবালার প্রথমটা খুব সংকোচ হচ্ছিল। এ লজ্জা রাখার জায়গা কোথায়? কিন্তু যে যা ভাবে ভাবুক। লোকেরা যদি নিন্দা করে, করুক। অপমান যদি নেমে আসে, আসুক। তবু সত্য গোপন করা উচিত নয়। তাছাড়া মা হয়ে ছেলেকে মিছে কথা কইবে কেন? পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অভাগিনী।

সত্যকামের প্রশ্ন ঃ তাহলে গুরুদেবকে কি বলব গিয়ে?

জবালা জানাল ঃ আমার নাম জবালা। অতএব, তুমি জবাল সত্যকাম। আমার নামেই তোমার গোত্রের পরিচয় হোক!

* * *

সত্যকাম যথাসময়ে আশ্রমে ফিরে এল। ভক্তিভরে গুরুকে প্রণাম করল। মন দিয়ে সে লেখাপড়া শিখতে চায়। বিদ্যালাভ করাই তার একমাত্র প্রার্থনা।

ঋষি গৌতম ফের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার বাবার নাম কি? কি-বা তোমার গোত্রের পরিচয়?

অকুতোভয়ে সত্যকাম উত্তর দিল ঃ বাবার নাম জানি না। মায়ের নামেই আমার গোত্রের পরিচয়। আমি জাবালা সত্যকাম।

আরো অনেক শিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সকলে তখন হতভম্ব। এ যে রীতিমত কলংকের কথা। মুখ দেখাবে কি করে? গুরুদেব নিশ্চয় একে তাড়িয়ে দেবেন। আশ্রমে ঠাঁই দেবেন না।

গৌতম ঋষি কিন্তু আসন থেকে উঠে এলেন। আনন্দে ভেসে যাচ্ছিলেন তিনি। সত্যকামকে বুকে টেনে নিলেন। আশীর্বাদের ভঙ্গীতে বললেন ঃ এখুনি তোমাকে দীক্ষা দেব। তৈরী হও। সত্যের পথ থেকে যে কখনো সরে দাঁড়ায় না, সে-ই তো আসল ব্রাহ্মণ। তুমি মিথ্যার আশ্রয় নাওনি। এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি সাহসী। বিদ্যালাভের উপযুক্ত।

[জাতক ।। ভগবান গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে এসেছিলেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। তাঁর আবির্ভাব, সিদ্ধিলাভ ও তিরোভাব ঘটেছিল বৈশাখী পূর্ণিমায়। কিন্তু এর আগে আরো বহুবার তিনি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন। এইসব জন্মে তাঁর নাম ছিল বোধিসত্ত্ব। স্বয়ং বুদ্ধদেব এইসব অতীত জন্মের কাহিনী বলতেন এবং শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। অতীত জন্মের সমস্ত কাহিনী নিয়েই জাতক ভরে উঠেছে। জাতকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচশো। পালিভাষায় রচিত এগুলি। আমরা এখানে যে গল্পটি বেছে রেখেছি, তা 'বেদত্ত জাতক' থেকে নেওয়া।

জাতক হল বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র। সেযুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় জাতকের অনুবাদ করা হয়েছিল। জাতকের সমস্ত গল্পের মধ্যে উপদেশ ছড়িয়ে রয়েছে। বৌদ্ধরা বলেন, যে কোন জীবকে নিজের মত ভেবো। যিনি এ জন্মে বুদ্ধ, তিনিই তো আগের জন্মে হরিণ, বানর, মাছ অথবা অন্যকিছু ছিলেন। বৌদ্ধরা আত্মা মানতেন না, কিন্তু জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা বলেন—বারবার সংসারের দুঃখকষ্ট পেয়ে অনেক সাধনার পরই পুনর্জন্ম বন্ধ হয়। এরই নাম নির্ব্বাণ। যাইহোক, বৌদ্ধরা ছিলেন জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কারের বিরোধী। তারা বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার বিবেচনা করতেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা ভাল। বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ সংগৃহীত হয়েছে 'ত্রিপিটক' নামক পবিত্র গ্রন্থে। সেদিক থেকে 'ত্রিপিটক' হল বৌদ্ধদের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থ। সমস্ত পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়েছিলেন সম্রাট অশোক।]

স্বার্থপরের বিপদ

সে সময় ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা। তাঁর রাজত্বে বাস করতেন একজন ব্রাহ্মণ। শহর থেকে দূরে, গাঁয়ের ভেতর। বামুনঠাকুরের ভারি একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ঠিক ঠিক দিনে তিথি-নক্ষত্র যদি মিলে যেত, অমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি মন্ত্র আওড়াতেন। আর রত্ন-বৃষ্টি হত তখুনি। ওপর থেকে ঝরে পড়ত সোনাদানা, মনিমুক্তো, চুনী পান্না হীরে।

বোধিসত্ত্ব এই বামুনঠাকুরের বাড়ীতে ছেলেবেলায় থাকতেন। আর লেখাপড়া শিখতেন। বিদ্যালাভ করতে হলে শিষ্যদের গুরুর বাড়ীতে থাকতে হত। এমনিধারা ছিল তখনকার দিনের নিয়ম।

একদিন গুরু শিষ্য মিলে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। নিরালা বনের পথ। হঠাৎ এক দঙ্গল ডাকাত এসে তাদের ঘিরে ধরল। ওরা দলে বেশ ভারী, সংখ্যায় শ'পাঁচেক তো হবেই। ডাকাতেরা বামুনঠাকুরকে বেঁধে ফেলল। ছেড়ে দিল কিন্তু বোধিসত্ত্বকে। বলল ঃ গুরুকে যদি উদ্ধার করতে চাও, তবে যাও। বাড়ী থেকে চটপট টাকাকড়ি নিয়ে এস।

কী আর করেন বোধিসত্ত্ব! টাকাকড়ি জোগাড় করতেই হয়। রওনা হবার আগে কানে কানে বললেন ঃ গুরুদেব, চিন্তা করবেন না। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরব। আজ গ্রহ-নক্ষত্র যোগ আছে। কিন্তু সাবধান, কোন কারণেই রত্নবৃষ্টি করাবেন না। যদি আমার কথা না শোনেন, মহা-সর্বনাশ ঘটবে।

বোধিসত্ত্ব আস্তে আস্তে চোখের আড়াল হলেন। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইলেন গুরু। তাঁর আর তর সইছিল না। সন্ধ্যে বেলায় ভরা পূর্ণিমার চাঁদ উঠল আকাশে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কী চাও বলতো? আমায় আটকে রেখেছ কেন?

ডাকাতেরা জানাল ঃ আমরা শুধু টাকা পেলেই খুশী।

বামুনঠাকুর বললেন ঃ বেশ তো, আগে আমার বাঁধন খুলে দাও। আমায় স্নান করাও, নতুন কাপড়-চোপড় পরাও, গায়ে চন্দন মাখাও, ফুলের মালা গলায় দোলাও। তোমরা যা চাইছ, এখুনি তাই পাবে।

ডাকাতেরা এতটুকু দেরী করল না। অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করল। বামুনঠাকুর মন্ত্র পড়লেন। খানিকক্ষণের মধ্যে রত্নবৃষ্টি সুরু হল। ডাকাতের দলবল তো আহ্লাদে আটখানা। সবকিছু কুড়িয়ে ফেলল তারা। পুটলি বাঁধল। ফিরে চলল নিজেদের ডেরায়। বামুনঠাকুর তো আর পথ চেনেন না। তাই তিনিও পিছু পিছু চললেন।

* * *

তারা দুপা এগিয়েছে কি এগোয়নি, আরো এক দঙ্গল ডাকাত সেখানে পৌঁছে গেল। এরাও সংখ্যায় পাঁচশ। নতুন ডাকাতেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা চেয়ে বসল। পুরাতন দল জবাব দিল ঃ মিছিমিছি আমাদের বিরক্ত করছ কেন? বরং ঐ বামুনঠাকুরকে পাকড়ে ধর। ওনার দয়ায় আমরা সবকিছু পেয়েছি। উনি ওপরের দিকে তাকালেই সোনাদানা আকাশ থেকে ঝরে পড়ে।

বামুনঠাকুর কিন্তু এবার মহা-ফাঁপরে পড়লেন। সত্যি কথাটাই বোঝাতে চেষ্টা করলেন। মাথা চুলকে বললেন ঃ এখন তো আর সেরকম তিথি-নক্ষত্রের যোগাযোগ নেই। অন্ততঃ একটা বছর অপেক্ষা করো। তারপর রত্নবৃষ্টি করাতে পারব।

যে সব ডাকাতেরা নতুন এসেছে, তারা বেজায় চটে গেল। তাদের সর্দার হুমকি দিল ঃ তবে রে বিটকেলে বামুন, ওদের বরাতে যত সোনাদানা, আর আমাদের বেলায় অষ্টরম্ভা! তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত।

তারা বামুনঠাকুরকে কেটে দু টুকরো করে ফেলল। তারপর দু'দল ডাকাতে লাগল হাতাহাতি লড়াই। সে কী প্রচণ্ড মারপিট। মাত্র দু'জন বেঁচে রইল। বাকীরা সব মরে ভূত!

ঐ দু'জন ডাকাত সোনাদানা নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল। একজন পাহারা দিতে থাকল খোলা তরোয়াল হাতে। অন্যজন গেল গাঁয়ে। চাল ডাল কিনে ভাত রাঁধল। মনে মনে ভাবল ঃ ওকে বা ভাগ দিতে যাব কেন? ভাতের সাথে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছি। জিভে ঠেকালেই অক্কা পেয়ে যাবে বাছাধন। তখন একা একা সব কিছু হাতাব।

এদিকে যে লোকটি পাহারা দিচ্ছিল, তারও মতলব ভাল নয়। যেই না বিষ-মাখানো ভাত এনেছে তার সঙ্গী, দ্বিতীয় ডাকাত এতটুকু দেরী করল না। তরোয়ালের কোপ বসাল গর্দানে। ধড় থেকে ছিটকে গেল মুণ্ডু। ফিনফিন করে রক্ত বইল। স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়ে

এবার চেটেপুটে ভাত সাবাড় করল। তারপর ছটফট করতে করতে বিষের জ্বালায় মরে গেল।

বোধিসত্ত্ব সেখানে যথাসময়ে পৌঁছলেন। মরে পড়ে আছে এক হাজার ডাকাত। বামুনঠাকুরও বেঁচে নেই। এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সবকিছু বুঝলেন।

বোধিসত্ত্ব সমস্ত ধনদৌলত গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দিলেন। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভাবলেন ঃ হায়, নিজের বিদ্যা জাহির করতে গেছলেন গুরুদেব। তার ফলে প্রাণ হারিয়েছেন। ডাকাতেরাও ভীষণ স্বার্থপর। এরা কেউ দলের কথা ভাবেনি, সঙ্গীসাথীর কথা ভাবেনি। শুধু নিজের কথাটুকু ভেবেছে। এদের দশা তাইতো এরকম হয়েছে। কেবলমাত্র নিজের সুখ সুবিধেটুকু দেখাও একধরনের পাপ। যারা পাপী, তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশকে ডেকে আনে।

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ

[আরব্য রজনী ॥ প্রাচীন পারস্যদেশে বহুকাল আগে এক বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম শাহরিয়ার। শাহরিয়ারের এক অদ্ভুত খেয়াল হল। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি নতুন নতুন বিয়ে করতেন, আর সকালে নিতেন তাদের গর্দান। এইভাবে কত যে মেয়ে মারা পড়ল, তার সীমাসংখ্যা নেই। একদিন উজীরের সুন্দরী কন্যা শাহারজাদী নিজের ইচ্ছায় বাদশাকে বিয়ে করলেন। ভালকরেই জানতেন, ভোর হলে তাঁকে প্রাণ দিতে হবে। তবু পিছপা হননি তিনি। রাত শেষ হওয়ার আগে শাহারজাদী গল্প বলা শুরু করতেন। এমনভাবে বলতেন, যে, ঠিক ভোরবেলায় বাকী থেকে যেত গল্পের শেষ অংশটুকু। এক এক করে বহু গল্প বাদশা মুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকলেন। এইভাবে কেটে গেল এক হাজার এক রাত। শাহাজাদীর প্রাণ বেঁচে গেল। গল্প বলার যাদুতে তিনি বাদশাকে সন্তুষ্ট করলেন। বাদশার বীভৎস খেয়াল বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

সাহিত্য জগতে আরব্য রজনী খুবই জনপ্রিয় গল্পের বই। বইটির আসল নাম 'আলিফ লায়লা'। আরবী ভাষায় লেখা। বাগদাদের বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল-রশিদ, যিনি প্রতিরাত্রে শহরের পথে পথে ঘুরতেন ছদ্মবেশে, তাঁর কথা বলা হয়েছে বহু গল্পের আগে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশ পেয়েছে।]

আলাদীন ছিল এক গরীব দর্জির ছেলে। লেখাপড়া শিখলো না। কেবল টো-টো করে ঘুরে বেড়াত। দুষ্টু ছেলেদের পাল্লায় পড়ে বয়ে গেল একেবারে। সারাটা সময় কাটাতে হৈ হুল্লোড়ে।

কিছুদিন বাদে তার বাবা মারা গেল। বলতে গেলে সংসারে আয় উপায় কিছু নেই। খুবই দুঃখে কষ্টে দিন কাটাতে লাগল ওদের।

একদিন এক দরবেশ ফকীর বাজারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আসলে সে এক বিদেশী যাদুকর। আলাদীনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এমন একটি সুন্দর ছেলেকে সে খুঁজছে অনেক দিন ধরে। আলাদীন তখন কিশোর। চেয়ে দেখবার মত ছিল তার চেহারা।

ফকীর এগিয়ে এসে আলাদীনের সঙ্গে আলাপ করল। বলল ঃ আমি তোমার চাচা। তোমার বাবা ছিলেন আমার বড় ভাই। তোমার মায়ের কাছে আমায় নিয়ে চল ব্যাটা।

গুটি গুটি পায়ে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল দুজনে। আলাদীনের মা খুবই অবাক হল ফকীরকে দেখে। আপন দেওরের কথা কস্মিনকালে শোনেনি সে। তবুও ফকীরের বজ্জাতি ঠাহর করতে পারল না।

ফকীর বড়ভাই-এর শোকে মায়া-কান্না আরম্ভ করল। তারপর চোখ মুছে বাজার থেকে কিনে আনল প্রচুর সবজী, মাংস আর মিঠাই। ঐ সঙ্গে এক ঝুড়ি মশলাপাতি। দামী দামী সাজ-পোষাক আনা হল আলাদীনের জন্য। তাছাড়া মা ও ছেলে দুজনে পেল বেশ কিছু সোনার মোহর।

পরপর কয়েকদিন যাতায়াত করল ফকীর। প্রতিদিন সঙ্গে আনত বিস্তর খাবার-

দাবার। উপহার দিত সোনার মোহর। ব্যাপার দেখে মা ও ছেলে আহ্লাদে আটখানা। মনে মনে ভাবল—বুঝি বা দুঃখের দিন শেষ হয়ে গেছে এবার।

একদিন সকাল বেলায় আলাদীনকে ডাকল ফকীর। তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। বলল ঃ তুমি আমার একমাত্র ভাইপো। তোমাকে বড়লোক বানাতে চাই আমি। কয়েকজন সওদাগরের সাথে আলাপ করে আসি চল।

খুশীতে ডগমগ হয়ে বেরিয়ে পড়ল আলাদীন। শহর পেরিয়ে গ্রাম, গ্রামের পর বন-বাদাড়, তারপর পাহাড়ের সারি। এতক্ষণে ক্লান্ত হায়ে পড়েছে আলাদীন। অবশেষে দুজনে এসে থামল এক নির্জন জায়গায়।

ফকীর শুকনো ডালপালা আনল। আগুন লাগিয়ে দিল তাতে। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়াল কিছুক্ষণ। ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল চারিদিক। দুলে উঠল পাহাড়। একটা গর্ত দেখা দিল পলকের মধ্যে।

আলাদীনের দিকে তাকিয়ে ফকীর বলল ঃ এই সুড়ঙ্গের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও। খানিকটা এগোলে একটা দরজা দেখতে পাবে। আপনা হতে খুলে যাবে সে দরজা। এবার পেরোতে হবে পরপর তিনখানা ঘর। প্রথম ঘরে তামার স্তুপ, দ্বিতীয় ঘরে রূপো, আর তৃতীয় ঘরে সোনার ছড়াছড়ি। কিন্তু সাবধান! ঐসব জিনিষে যদি হাত লাগাও, তাহলে পাথর হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

ফকীর বলে চলল ঃ ঘরগুলোর পর দেখতে পাবে একটা সুন্দর বাগান। বাগানে রয়েছে একখানা মনোরম বাড়ী। সেই বাড়ীতে একটা কুলুঙ্গীর ভেতর দাঁড়িয়ে আছে পেতলের পিলসুজ। তার মাথায় টিম টিম করে জ্বলছে প্রদীপ। প্রথমে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফেলো। তারপর ঐ প্রদীপখানা নিয়ে চলে এসো তুমি।

ভয়ে আলাদীনের বুক কেঁপে উঠল। ফকীর তখন একটা ছোট আংটি আলাদীনের হাতে পরিয়ে দিল। অভয় দিয়ে বলল ঃ তুমি ছাড়া ঐ সুড়ঙ্গে কেউ ঢুকতে পারবে না। তুমিই কেবল এই গুপ্তধনের একমাত্র হকদার। তার উপর হাতের ঐ আংটি থাকলে কোন বিপদের ভয় নেই তোমার।

আলাদীন সুড়ঙ্গ ধরে নীচে নামল। তারপর যথাসময়ে ফিরে এল প্রদীপ নিয়ে। হাসতে হাসতে বলল ঃ আমাকে গর্তের উপর তুলে ফেলুন চাচা!

ভীষণ রেগে গেল ফকীর। চোখ লাল করে বলল ঃ তোর চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। আগে আমায় প্রদীপ দে, কুত্তার বাচ্চা।

থতমত খেয়ে আলাদীন বলল ঃ আমার ভয় লাগছে চাচা। আমায় ওপরে তুলুন আপনি।

আরো রেগে গেল ফকীর। দুই থাপ্পড় কষালো আলাদীনের গালে। টাল সামলাতে না পেরে একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়ল আলাদীন। গুহায় ঢোকার ক্ষমতা ফকীরের ছিল না।

ফুঁসতে ফুঁসতে মন্ত্র পড়ল সে। আবার পাহাড় দুলে উঠল। গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে গেল আপনা আপনি।

আলাদীন এতক্ষণে বুঝতে পারল, লোকটা ফকীর-টকীর নয়। তার চাচাও নয়।

নিশ্চয় কোন শয়তান যাদুকর। কিন্তু এখন কী করবে সে? কীভাবে উদ্ধার পাবে? ভয়ে আর ভাবনায় কাঁদতে থাকল।

হঠাৎ হাতের আংটিটা ঘষা লাগল সুড়ঙ্গের দেয়ালে। অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল তখুনি! এক কালো দৈত্য দাঁড়াল আলাদীনের সামনে। হাত জোড় করে বলল: আমি আংটির দৈত্য। আমায় হুকুম করুন মালিক। এক নিশ্বাসে আলাদীন জানাল: গুহা থেকে মুক্ত কর। আমাকে পেঁাছে দাও আমার বাড়ীতে।

কথা শেষ হতে না হতে আলাদীন পেঁাছে গেল নিজের বাড়ীতে। মাকে সব কথা খুলে বলল আলাদীন।

পরদিন সকালে আলাদীন বলল: মাগো, ঘরে তো একটা কানাকড়িও নেই। ঐ প্রদীপটা বেচব আমি। তুমি ওটা ঘষে মেজে পরিষ্কার কর।

ছাই দিয়ে প্রদীপটাকে মাজতে বসল মা। একবার ঘষা লাগাতেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল আবার। সামনে হাজির হল এক বিরাট কালো দৈত্য। ভয়ে মূর্ছা গেল মা। আলাদীন কিন্তু ভয় পেল না। প্রশ্ন করল: তুমি কে?

মাথা নুইয়ে নমস্কার করল দৈত্য। বলল: এই প্রদীপ আমার ভগবান। যেহেতু প্রদীপ এখন আপনার কাছে, অতএব আমি আপনার চাকর। আমাকে আদেশ করুন প্রভু।

আলাদীনের হুকুমে প্রচুর খাবার দাবার আনল দৈত্য। রাজা রাজড়ারাও এমন খাবার দেখেনি কখনো। সেই খাবার খেয়ে পেট ভরে গেল মা ও ছেলের।

কয়েকদিনের মধ্যে আলাদীনের নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। বিশাল প্রাসাদে এখন বাস করে সে। সোনা-রূপো হীরে-পান্না ছড়িয়ে থাকে ঘরে। বহু ধন-দৌলত। অসংখ্য লোক লস্কর আর দাস-দাসী। সব কিছুই দৈত্যের কারসাজি।

সুলতানের একমাত্র সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছে আলাদীন। দেশের সেরা ধনী সে। কিন্তু গরীব-দুঃখীর কথা ভোলেনি আদৌ। রোজ হাজার হাজার গরীব তার বাড়ীতে আসে, পাত পেতে খায়, আর জয়ধ্বনি দেয়। আনন্দে ভরে উঠে আলাদীনের মন।

✻ ✻ ✻

এদিকে সেই যাদুকর এসে পেঁাছল সুলতানের রাজ্যে। আলাদীনকে গুহার ভেতর পাথর চাপা দিয়েছিল এই যাদুকর। আলাদীনের ভাগ্য দেখে হিংসা হল তার। গালি দিল: যেভাবে হোক, তোমাকে খতম করব এবার।

সেদিন আলাদীন শিকারে গেছে। সুযোগ বুঝে তার বাড়ীতে এল যাদুকর। ছদ্মবেশ নিয়েছে সে। সেজেছে ফিরিওয়ালা। সুর দিয়ে হাঁক পাড়ল: পুরানো প্রদীপের বদলে কে নেবে নতুন প্রদীপ। কে নেবে গো, কে নেবে....

রাজকন্যা মজা পায় একথা শুনে। না বুঝে-সুজে যাদুকরকে দেয় আশ্চর্য প্রদীপ। বদলে নেয় নতুন একখানা।

যাদুকর যেন স্বর্গ পেয়ে গেল হাতে। আড়ালে গিয়ে প্রদীপ ঘষল সে। সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল দৈত্য। কুর্নিশ করে জানাল : আমায় হুকুম করুন মালিক।

যাদুকরের আদেশে দূরদেশে উড়ে গেল দৈত্য। মাথায় করে বয়ে আনল আলাদীনের বৌ, দাসদাসী আর ঘরবাড়ী। রাজকন্যা এখন যাদুকরের হাতে বন্দী।

মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খুব ক্ষেপে গেলেন সুলতান।

জামাই-এর প্রাণদণ্ড দিলেন তিনি। কিন্তু কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এল রাজবাড়ীর

দিকে। আলাদীনকে ভালবাসে রাজ্যের প্রতিটি প্রজা। বাধ্য হয়ে হুকুম ফিরিয়ে নিলেন সুলতান। আলাদীনের প্রাণ রক্ষা হল।

আংটির দৈত্যকে ডাকা ছাড়া এখন আর অন্য উপায় নেই। কিন্তু আংটির দৈত্য মাথা নীচু করে জানাল ঃ প্রদীপের দৈত্য আমার ওস্তাদ। তার কোন কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করুন। তবে আপনাকে রাজকন্যার প্রাসাদের সামনে আমি রেখে আসব।

তাতেই রাজী হল আলাদীন। গোপনে দেখা হল রাজকন্যার সঙ্গে। কেঁদে ভাসিয়ে দিল রাজকন্যা। আলাদীন সান্ত্বনা জানাল। রাজকন্যা বুঝে নিল, কী কী করতে হবে এরপর।

অক্ষরে অক্ষরে সব কাজ করল রাজকন্যা। বিষ মেশানো মিঠাই খেয়ে যাদুকর প্রাণ হারাল। হারানো প্রদীপ ফিরে পেল আলাদীন। আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সে। ঘষামাত্র হাজির হল প্রদীপের দৈত্য। সেলাম ঠুকে সে বলল ঃ আদেশ করুন প্রভু।

যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনি হয়ে গেল আবার। পলকের মধ্যে আলাদীন ফিরে পেল সুন্দরী স্ত্রী, প্রাসাদ, দাসদাসী, লোকলস্কর ইত্যাদি। সুখে ঘরকন্না করতে লাগল রাজকন্যা। আলাদীনের মান-মর্যাদা আরো বেড়ে গেল।

এখনো বিপদ কাটেনি পুরোপুরি। এক সাধুর অনুরোধে একদিন আলাদীন প্রদীপের দৈত্যকে ডাক দিল। বলল ঃ শোবার ঘরে রক পাখীর ডিম ঝুলিয়ে রাখতে চায় আমার স্ত্রী। ঐ ডিম এনে দাও তুমি।

কথা শোনামাত্র বিকট চীৎকার আরম্ভ করল দৈত্য। ধীরে ধীরে বলল ঃ অন্য কেউ হলে আমি তাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতাম। কিন্তু আপনি চিরকাল আমার ওপর সদয় ব্যবহার করেছেন। ঐ সাধু হল যাদুকরের ভাই। সে এসেছে প্রতিহিংসা নিতে। রকপাখী হল দৈত্যদের দেবতা। তাঁকে অপমান করতে পারি না।

আলাদীন নিজের ভুল বুঝতে পারল। ক্ষমা চাইল দৈত্যের কাছে। তারপর বহুকাল ধরে সুখে শান্তিতে জীবন কাটিয়ে দিল আলাদীন। সে জানত ঃ সদয় ব্যবহারের কোন দাম লাগে না। কিন্তু এর ফলে বহু বিপদ থেকে রক্ষা পায় মানুষ।

[**শ্রীচৈতন্য-চরিতগ্রন্থ** ॥ এখন থেকে ঠিক পাঁচশো বছর আগে দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল নবদ্বীপ শহরের মায়াপুরে। তাঁর পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, আর মায়ের নাম শচীদেবী। চৈতন্যদেবের পোষাকীনাম বিশ্বম্ভর মিশ্র। ডাকনাম অবশ্য নিমাই। তাঁর গায়ের রং ছিল খুবই ফরসা। সেজন্য গৌরাঙ্গ বা গোরা নামেও তাঁকে ডাকা হত। সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাঁর নতুন নামকরণ হয়—কৃষ্ণচৈতন্য। নিমাই প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। সাপের কামড়ে প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। তখন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। আর কখনো ফিরে আসেননি। বড়জোর সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ বছর পর্যন্ত চৈতন্যদেব ছিলেন এই পৃথিবীতে। ঠিক কিভাবে তাঁর তিরোভাব ঘটেছিল, সে কাহিনী এখনো রহস্যময়।

সেকালে বাঙ্গালী জাতি যেন মরে গিয়েছিল। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় তিনি আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। নতুন করে পথ দেখিয়েছিলেন। আমরা জেনেছিলাম—মানুষের ভেতরেই দেবতাদের বাস। মানুষকে ভালবাসলেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ঝরে পড়ে। তিনি শিখিয়েছিলেন—জ্ঞানের চাইতে ভক্তি বড়। সত্যিকারের হরিভক্তি থাকলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। তিনি আমাদের কাছে চিরকালের 'মহাপ্রভু'। তাঁর জীবনকাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্যে দুটি বিখ্যাত বই আছে। একটি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', অন্যটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'। চৈতন্যদেবের সাথে সাথে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, রূপ-সনাতন, যবন হরিদাসের কথা আজো আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।]

দিগ্বিজয়ীর দর্পনাশ

নিমাই পণ্ডিতের তখন কতই বা বয়েস! বড় জোর যুবক বলা যায়। সবেমাত্র টোল খুলেছেন তিনি। ছাত্রেরা দলে দলে এসেছে। লোকের মুখে প্রশংসা ধরে না।

একে তো নিমাই পণ্ডিতের বয়স কম। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। রূপ যেন

ফেটে পড়ছে। আবার, জ্ঞানের দিক থেকে সবাইকে ছাপিয়ে যান। তার উপর পড়ানোর ঢংটি অতি চমৎকার। নবদ্বীপ শহরে তাই নামডাক ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না এতটুকু।

দিনগুলো কাটছিল এমনি করে। মহা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল তারপরেই। একদিন নবদ্বীপ শহরে পৌঁছলেন। মস্তবড় এক পণ্ডিত। কাশ্মীর থেকে এসেছেন। তাঁর নাম কেশব আচার্য। ভারি অহঙ্কারী মানুষ। পাল্কী চড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ান। দেমাকে যেন মাটিতে পা পড়ে না।

সারা ভারত ঘুরেছেন। যেখানেই গেছেন, সেখানকার পণ্ডিতদের মুখো-মুখি হয়েছেন। সবাইকে তর্কযুদ্ধে ডেকেছেন। আর হারিয়ে দিয়েছেন অনায়াসে।
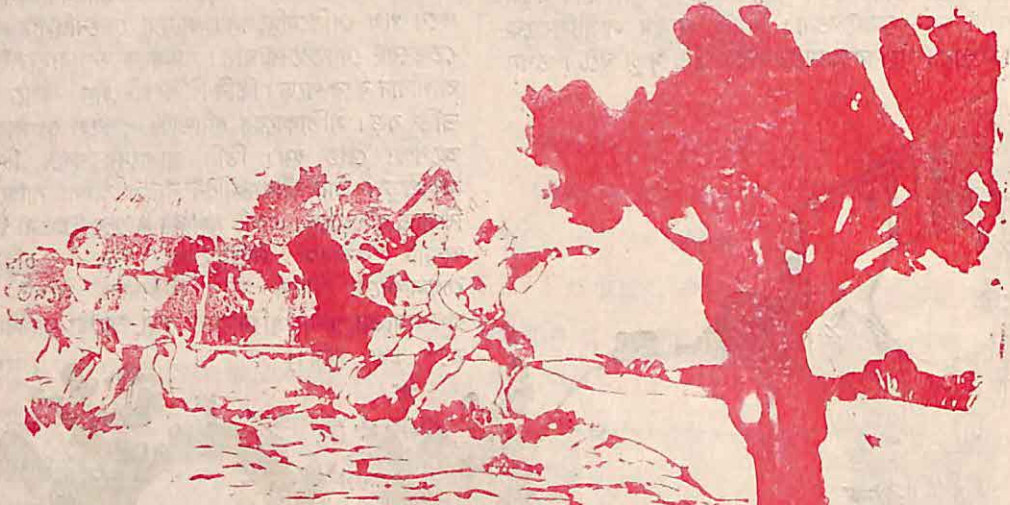
এহেন পণ্ডিত আজ নবদ্বীপে ঢুকে পড়েছেন। সকলের অবস্থা তখন ভয়ে আধমরা নবদ্বীপের সম্মান বুঝি যায়! লোকে বলাবলি করত, কেশবের জিভের ডগায় নাকি মা সরস্বতী বসে থাকেন। অতএব, তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠবে কে?

নিমাই কিন্তু অতসব খবর রাখতেন না। ছাত্রদের পড়াচ্ছিলেন সেদিন বিকেল বেলায়। পাশেই গঙ্গা নদী। বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে। সুন্দর, শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ।

বলা নেই, কওয়া নেই। একেবারে হঠাৎই। আচার্য কেশব হাজির হলেন সেখানে। কেমন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি তাঁর চোখে। বলেই ফেললেনঃ তোমার নাম নিশ্চয় নিমাই। শুনেছি, তুমিই এখানকার সেরা। তোমার সঙ্গে আমি তর্কযুদ্ধে নামব। কবে তৈরী হতে পারবে বলো!

নিমাই জবাব দিলেন খুবই ধীরে ধীরেঃ হে দেব! আপনি আমাদের অতিথি। আগে দয়া করে বসুন। তারপর কথাবার্তা হবে।

কেশব বললেনঃ তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু তুমি তো দেখছি, একফোঁটা ছোকরা। কতটা সময় আর আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে? তোপের মুখেই উড়ে যাবে। যাক গে, ঘাবড়ে যেও না। তুমি যে পরাস্ত হয়েছ, কাগজে-কলমে বরং লিখে দাও। ঐ জয়পত্রটুকু পেলেই আমার চলবে।

নিমাই এবারও বিনয় দেখালেন। হাত জোড় করে বললেনঃ প্রভু, আমরা পরম ভাগ্যবান। আপনাকে হাতের সামনে পেয়েছি। এত সহজে ছাড়ছি না। পবিত্র গঙ্গা নদীর উপর আপনি মনে মনে কবিতা রচনা করুন। আমরা শুনতে চাই।

আচার্য কেশব এতটুকু দেরী করলেন না। গড়গড় করে আওড়ে চললেন বিরাট লম্বা এক কবিতা। কমপক্ষে একশো লাইন তো হবেই। ঠিক যেন ঝড়ের গতিতে আবৃত্তি করলেন। যে শুনল, সেই মুগ্ধ হল। কী আশ্চর্য প্রতিভা! চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না। সরস্বতীর বরপুত্রই বটে।

নিমাইও ধন্য ধন্য করলেন। বললেনঃ আপনি একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কবিতা রচনার ব্যাপারেও অনেক বড়। এমনটা দেখা যায় না।

একগাল হেসে কেশব জানালেনঃ হেঁ হেঁ, লোকেরা তাই বলে। আমি সারা ভারত জয় করেছি। নবদ্বীপই শুধু বাকী। হয় তর্কযুদ্ধে নামো, নয়তো জয়পত্র লিখে দাও। আমার তর সইছে না।

নিমাই ওকথায় আমল দিলেন না। মৃদুকণ্ঠে বললেনঃ আপনার কাছাকাছি যাবার যোগ্যতা আমার নেই! এখন আপনার কবিতাখানা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন। আমাদের ছাত্র বলে ভাবুন।

টিকি নাড়তে নাড়তে কেশব বললেনঃ বেশ তো, কোন অংশ বুঝতে চাও বলো।

নিমাই মাঝের কয়েকটা শ্লোক গড়গড় করে বললেন। পরিষ্কার উচ্চারণ। ঠিক যেন কত আগে থেকে মুখস্থ করা। এতটা নিখুঁত।

কেশব মনে মনে চমকে উঠলেন। একবার মাত্র শুনে কি এমন ভাবে মুখস্থ রাখা যায়? মানুষের কি এমন স্মরণশক্তি হয়? এ যে অলৌকিক কাণ্ড! তবু গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। তারপর প্রশ্ন তুললেন ঃ অন্য কিছু কি জানতে চাইছো?

নিমাই শান্ত কণ্ঠে জানালেন ঃ ঐসব শ্লোকে দোষ–গুণ কোথায়? ব্যাকরণের দিকটাও ভাবুন। দয়া করে শুদ্ধ–অশুদ্ধ বাছাই করে দেখান।

আচার্য কেশব দারুণ চটে গেলেন। চড়া গলায় বললেন ঃ তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। কোন সাহসে এসব কথা বলছো? জেনে রেখো, আমার রচনায় এক ফোঁটাও দোষ থাকতে পারে না।

অনেকটা সময় নিলেন নিমাই। অতিথির যাতে অপমান না হয়, সেদিকটা লক্ষ্য রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন ঃ আমায় ক্ষমা করুন, দেব! কিন্তু বড় বড় কবির রচনাও দোষগুণে ভরা থাকে। এমন কি, কালিদাসও তার বাইরে নন। আপনার ঐ শ্লোকে ভেতর পাঁচ–পাঁচটা দোষ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

নিমাই চুলচেরা বিচার আরম্ভ করলেন। দেখিয়ে দিলেন দোষ আর গুণ। কেশব চুপচাপ শুনলেন। রা কাড়তে পারলেন না। তারপর সেখান থেকে উঠে গেলেন নিঃশব্দে। ভোরবেলায় তাঁকে আর নবদ্বীপ শহরে দেখা গেল না। রাতের অন্ধকারে তিনি পালিয়ে গেছেন। লজ্জার হাত থেকে বেঁচেছেন।

নিমাইয়ের কীর্তি, নিমাইয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নবদ্বীপের গৌরব রক্ষা করলেন একজন তরুণ পণ্ডিত। শিষ্যেরা মহাখুশী। পড়শীরা আহ্লাদে আটখানা। নিমাইয়ের কিন্তু এতটুকু গর্ব নেই।

নিমাই শুধু ছাত্রদের উপদেশ দিলেন ঃ অহঙ্কার দেখানো মস্তবড় পাপ। ভগবান তা সহ্য করেন না। একটা জিনিস তাকিয়ে দেখো। ফলে ভরা গাছ আর গুণে ভরা মানুষ— এদের স্বভাবটাই আলাদা। এরা সব সময় নম্র হয়, বিনয়ী হয়।

সাচ্চা আর ঝুটা

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ॥ কাছাকাছি দেড়শ বছর আগে কামারপুকুরে জন্ম নেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁর আসল নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ভক্তেরা তাঁকে 'ঠাকুর' বলে ডাকে, আর পূজো করে ভগবানের মত। রামকৃষ্ণ কোনদিন স্কুল কলেজে লেখাপড়া শেখেননি। তবুও জ্ঞানের জগতে তাঁর আসন ছিল খুবই উঁচুতে। তিনি বলতেন—'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ সব ধর্মই সমান। সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করা উচিত একেবারে সমানভাবে। রামকৃষ্ণ নিজে শ্রদ্ধা করতেন হিন্দুধর্মের সব শাখা—বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈবমত। ভারতের বৌদ্ধ, জৈন, শিখধর্ম আর সাথে সাথে ইসলাম কিংবা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি কোন অংশে কম ছিলনা। খুব কঠিন কঠিন বিষয়ে রামকৃষ্ণ যখন বোঝাতেন, তখন মনে হত যেন জলের মত সোজা। উপদেশ দানের সময় জুড়ে দিতেন একটি করে গল্প। যে শুনত, সে মুগ্ধ হত!

রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী। রামকৃষ্ণ সেখানে এসেছিলেন পুরোহিতগিরির কাজ নিয়ে। তারপর থেকে সেখানে থাকতেন প্রাচীন মুণিঋষির মত। তাঁর স্ত্রীর নাম সারদামণি। স্বামী বিবেকানন্দ হলেন রামকৃষ্ণের সবচেয়ে বিখ্যাত শিষ্য। আবার ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যা। রামকৃষ্ণের কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে লেখা হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) একেবারে কাছটিতে বসে যা দেখতেন এবং শুনতেন, তাই টুকে রাখতেন রোজ। সেজন্য সবদিক থেকে এই অমূল্য গ্রন্থের তুলনা মেলা ভার।]

গ্রামের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে দু-তিনটে লম্বা লম্বা খাল। সেগুলো আবার মিশেছে একটামাত্র জায়গায়। তারই ধারে গড়ে উঠেছে মস্তবড় গঞ্জ। নিত্য হাটবাজার বসে. ব্যবসা-বাণিজ্য হয়। লোক আনাগোনার যেন বিরাম নেই। রোজ সকালে বিকালে গমগম করে ওঠে জায়গাটা।

সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মস্তবড় এক স্যাকরার দোকান। আলোর কণা যখন ঠিকরে পড়ে, সোনা রূপোর গয়নাগুলো তখন ঝলমল করে ওঠে। সে তল্লাটে প্রচুর নামডাক দোকানটার। সকলে একবাক্যে চেনে। কেনাবেচার ধুম লেগেই আছে।

অজ গাঁ থেকে এসেছে একজন চাষী। সঙ্গে তার বৌ। ছোট্ট ছোট্ট দু একটা গয়না গড়াবে তারা। অনেক দিনের সাধ আহ্লাদ। বছরের পর বছর কেটেছে, বহু কষ্টে কটা টাকা সঞ্চয় করেছে। যৎসামান্য পুঁজি। তাই মনের মত একটা দোকান খুঁজছিল তারা।

শেষকালে এই স্যাকরার দোকানটাই মনে ধরল। কর্মচারীরা আপন মনে কাজ করছে। মালিক বসে আছে

গদির উপর। গায়ে নামাবলি আর মাথায় মস্ত টিকি। কী সুন্দর সৌম্য চেহারা। দেখলেই বোঝা যায়, সকলে পরম বৈষ্ণব। গলায় তুলসীকাঠের মালা, হাতে হরিনামের ঝুলি, আর মুখে সদা সর্বদা ঈশ্বরের নাম। কোন সন্দেহ নেই, সকলে তারা ভক্ত সাধু। শুধু পেট চালানর জন্যই যা দোকানদারি করা।

আর কী বিনয়! দেখলেও যেন মন গলে যায়। হয়ত বা এজন্য খদ্দেরদের ভীড় লেগে থাকত সারাক্ষণ।

চাষী আর চাষী-বৌ গুটি গুটি পায়ে দোকানটায় এসে উঠল। ইতি-উতি এদিক-ওদিক তাকাল অবাক চোখে। হ্যাঁ, এতক্ষণে ঠিক জায়গায় পেঁাচেছে তারা। আর কোন ভাবনা নেই। কর্মচারীদের একজন মহা খাতির করে তাদের বসাল। কাজের ফাঁকে সেরে নিল এক-আধটা কথা। কোথায় বাড়ী, কেন এসেছ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গদীর উপরে বসে আছে স্যাকরা। ভাবের ঘোরে উচ্চারণ করল ঃ কেশব! কেশব!

কোনের দিক থেকে কর্মচারীটিও বলে উঠল ঃ গোপাল! গোপাল!

এইসব শুনে আরো শ্রদ্ধা বাড়ল চাষী-দম্পতির। আনন্দে নেচে উঠল মন। আর যাই হোক, ঠকবার কোন ভয় নেই। পূজোর ঘরে যেমন একটা পবিত্র ভাব থাকে, দোকানটাতেও তাই। বড় নিশ্চিন্ত লাগছে! ঠাকুর দেবতার উপর যাদের এত ভক্তি, তারা কি কখনো ঠগ-জোচ্চর হয়?

এবারে দোকানদারই পাকা কথা বলল। নিজেই নিল গয়না গড়াবার ফরমায়েস। টাকাকড়িও ফয়সলা হল। ধীরে-সুস্থে সমস্ত কাজ মিটে গেল। বিন্দুমাত্রও তক্কাতক্কি হল না।

আবার ওপাশ থেকে একজন কর্মচারী বলে উঠল ঃ হরি! হরি!

মালিকও তাল মিলিয়ে বলল ঃ হর! হর!

এইভাবে সদাসর্বদা ভগবানের নাম শুনতে শুনতে চাষী আর তার বৌ গয়না গড়িয়ে নিল। কথামত টাকা পয়সা মেটাল। তারপর পা বাড়াল নিজেদের গ্রামের পথে। খুশীতে ডগমগ তারা।

* * *

বাড়ীতে পেঁাছল ভর দুপুরবেলায়। খাওয়া দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিল দুজনে। মনে মনে অনেক স্বপ্ন। গয়না কিনেছে তারা। এও তো এক রকমের সম্পত্তি। আনন্দ যেন ধরে না।

পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ঠিক সেই সময় সামনের পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। চালাক চতুর মানুষ। মুরুব্বি হিসেবেও গ্রামের সবাই মানে। চাষীটি প্রথমে হাঁক পাড়ল ঃ পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, একবার এদিক পানে শুনে যাবেন?

পণ্ডিতমশাই আসামাত্র ওরা মাদুর বিছিয়ে দিল। আনল পা ধোয়ার জল। কল্কে সাজল বড় তাড়াতাড়ি। স্বামী স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকল সলজ্জ নীরবে।

এক ছিলিম তামাক টেনে পণ্ডিত শুধোলেন ঃ ওরে, তোরা দুটিতে আজ কোথায় গেছলি ?

চাষী বৌ-এর মুখে তখন হাসির আভা ছড়ান। সেই-ই কথা আরম্ভ করল। বলল ঃ সেই কথাই ত বলছি আমি। একটা গয়না গড়িয়ে এনেছি। দেখবেন আপনি ?

পণ্ডিত উত্তর দিলেন ঃ তাই নাকি রে! কই দেখি, দেখি!

পণ্ডিতের হাতে তুলে দেওয়া হল গয়না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর চোখ তুলে জানালেন ঃ ওরে, তোরা যে ডাহা ঠকেছিস দেখছি। কোন দোকান থেকে কিনেছিস ?

চাষী আর চাষী বৌ-এর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তারা যেন নিজেদের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিল না। শুধু ম্লানমুখে কোনরকমে বলল ঃ কিন্তু আমরা যে মস্তবড় ভক্তের দোকান থেকে কিনেছি। সব সময়েই সেখানে ঠাকুর নাম। এ যে হতে পারে না পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিত ঃ ভক্তের দোকান ? ঠাকুর-নাম ? ব্যাপারটা খোলসা করে বলত শুনি !

চাষী ঃ কথার ফাঁকে ফাঁকে ওরা কেবল জপ করছিল—কেশব, কেশব ; গোপাল, গোপাল ; হরি, হরি ; হর, হর।

একটুখানি কী যেন ভেবে নিলেন পণ্ডিত। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বোঝালেন ঃ ওরে এগুলো কিন্তু আদপে ঠাকুর নামই নয়। গোপন ইঙ্গিতে কথা চালাচালি। 'কেশব, কেশব' কথাটার মানে হল—এরা সব কে ? 'গোপাল, গোপাল'—এর অর্থ, এরা সব গরুর পাল। সোজা কথায়, বোকাসোকা হাঁদারামের দল। তারপর বলছে, 'হরি, হরি'। অর্থাৎ, আমরা কি চুরি করব, হরণ করব ? সবশেষে 'হর, হর'। তার মানে, মালিক আদেশ দিচ্ছে—বোকাপাঁঠার দল যখন ঢুকেছে খোঁয়াড়ে, তখন চেটেপুটে খাও। সবটুকু চুরি করে নাও।

চাষী ভেঙ্গে পড়েছিল দুঃখে। চাষী বৌ কিন্তু সান্ত্বনা জানাল ঃ হয়ত মোদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। তবু মানুষ চেনার যে অভিজ্ঞতা হল, তার দামও ফেলনা নয়।

পণ্ডিতমশাই আওড়ালেন ঃ ভণ্ড মানুষদের বহু রকমের সাজ, বহু ছদ্মবেশ। লোক ঠকাতে ওরা ওস্তাদ। বাইরের থেকে মনে হবে, যেন কত বড় সাধু। আসলে কিন্তু চোরেরও অধম।
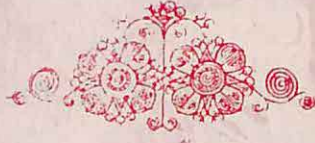
[জৈনশাস্ত্র ॥ আমাদের ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ। বিবাদ ঘটেছে কখনো, কিন্তু মিলনের পালা দেখা গেছে তারপর। বাইরের থেকে এসেছে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম, তবু শেকড় গেড়েছে এখানে। এমনকি পার্শী ও ইহুদী ধর্মেরও ঠাঁই মিলেছে সহজে। পার্শীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দাবেস্তা', উপাস্য দেবতা আহুর-মাজদা। তাদের কাছে অগ্নি ও সূর্য অতি পবিত্র এবং তারা জরথুস্ট্র-এর অনুগামী। যাইহোক, জৈনধর্ম কিন্তু খুবই প্রাচীন। চব্বিশজন তীর্থঙ্করের আবির্ভাব ঘটেছিল ভারতে। প্রথমজন ঋষভদেব, আর শেষ দুজনের নাম পরেশনাথ ও মহাবীর। এঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। যে কোন প্রাণীকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেওয়াও জৈনধর্মে নিষিদ্ধ।

মহাবীর জন্ম নিয়েছিলেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশীতে তাঁর আর্বিভাব, তিরোভাব ঘটে কার্তিকী অমাবস্যার রাতে। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। বার বছর কঠিন তপস্যার শেষে লাভ করেন সিদ্ধি। তারপর তিরিশ বছর বহু দেশ ভ্রমণ করে তিনি যে উপদেশ দান করেন, তা হল জৈনসূত্রের মূলকথা। মহাবীর নিজের শরীরের উপর যেভাবে বারবার দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছিলেন, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। তিনি সবাইকে ডাক দিয়ে বলতেন অলস হয়ে থেকোনা, মিছিমিছি সময় নষ্ট করোনা। গাছের পাতা যেমন ঝরে যায়, আয়ুর ক্ষয় হচ্ছে ঠিক তেমনি। মহারত্ন পড়ে আছে চোখের সামনে, এখুনি তা তুলে নাও।]

মেঘকুমারের মুক্তি

মহাবীর তখন সবে সন্ন্যাসী হয়েছেন। মোরাক গ্রামে পেঁাছে গেলেন একদিন। সেখানকার আশ্রমে কয়েকটা মাস কাটাবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। আশ্রমের মানুষেরা অবশ্যি তাঁকে খুবই আদর যত্ন করল। তাঁরই জন্য ছেড়ে দেওয়া হল খড়ে ছাওয়া ছোট্ট একটি কুটির।

মহাবীর ঘরে থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মন উধাও হয়ে যায় কোথায় কতদূরে। বেশীর ভাগ সময় তিনি ধ্যানে বসেন। বাকীটা সময় চিন্তার জগতে ডুবে যান। কোন কিছুতে তাঁর খেয়াল থাকে না।

গাইবাছুরের পক্ষে এ সুযোগটুকু যথেষ্ট। ওরা ঘরে ছাওয়া খড়বিচালি টেনে টেনে খেল। আশ্রমবাসীরাও ব্যাপারটা টের পেয়ে গেল। তারা ভাবল ঃ মহাবীর ইচ্ছে করেই এ অবহেলা দেখালেন। অপরের জিনিস তো, তাই কোন টান নেই।

দু-চারজন মুখ ফুটে কথাটা বলে ফেলল। তাদের গলায় ধমকের সুর যেন ঃ পাখীরা পর্যন্ত নিজেদের নীড় রক্ষা করে। আপনি ক্ষত্রিয়, আপনি কিনা ঘরটার দিকে নজর রাখলেন না ?

মহাবীর ভাবলেন ঃ আমি ধ্যান করব, না এসব নজর রাখবো ? তাহলে সংসার ছেড়েই বা লাভ কি ? সন্ন্যাসীদের তো মায়া-মমতা থাকা ঠিক নয়।

মহাবীর আর সে আশ্রমে থাকলেন না।

* * *

কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। সারা ভারতে তখন মহাবীরের খ্যাতি। একদিন এক রাজপুত্র এল দীক্ষা নিতে। বয়েস খুবই কম। নাম মেঘকুমার।

মহাবীর জিজ্ঞেস করলেন ঃ সংসারে থেকে ধর্মকর্ম করবে, না সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে ? শ্রাবক অথবা শ্রমণ, কোনটা হতে চাও ?

মেঘকুমার উত্তর দিল ঃ সবচেয়ে কঠিন কাজটাই করব। প্রভু, আমাকে শ্রমণ হতে দিন।

মধুর হাসিতে ভরে উঠল মহাবীরের মুখ। জানালেন ঃ বেশ, তাই হোক!

জৈনদের মঠকে বলা হয় চৈত্য। মেঘকুমারের থাকবার ব্যবস্থা হল সেখানে। সবেমাত্র সে দীক্ষা নিয়েছে। তাই সবার শেষে তার বিছানা পাতা হল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন তাকে মাড়িয়ে দিলেন। এক আধবার নয়, বারবার ঘটল একই রকম ব্যাপার। সে রাতে আর ঘুম হল না। মেঘকুমার ভাবল ঃ সাধুরা জেনেশুনে এরকমটা করছেন। এ যে দারুণ অবহেলা। মহাবীর কি আর একটু ভাল জায়গা দিতে পারতেন না?

সকালবেলায় মেঘকুমার চুপটি করে বসে থাকল। তার চোখে মুখে বিরক্তি আর অভিমান। অপরের মনের খবর পাওয়া বেশ কঠিন। মহাবীর কিন্তু সহজে পড়ে নিলেন। শুধু জানালেন ঃ রুক্ষ কথা বলে অন্যের মনে কষ্ট দিও না। এও তো এক রকমের পাপ।

পরের রাতে একই ঘটনা আবার। মেঘকুমারকে শুতে হল একেবারে দরজার পাশে। সে যখন উঠছে, সবাই ডিঙিয়ে যাচ্ছে। আর বারবার পা লাগছে তার গায়ে।

মেঘকুমারের মাথা গরম হল। সে ভাবল ঃ রাজবংশে আমার জন্ম। আমি অন্যের লাথি সহ্য করব না। তার চাইতে সংসারে ফিরে যাওয়া ভাল।

পরের দিন সকালবেলায় মেঘকুমার এসে দাঁড়াল মহাবীরের কাছে। একটিবার চোখ তুলে তাকালেন মহাবীর। শান্তস্বরে বললেন ঃ এইটুকুতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললে? তুমি তো এতখানি দুর্বল ছিলে না! তোমার আগের জন্মের কথা কি মনে পড়ে?

মেঘকুমারের সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল। বিদ্যুৎ খেলল শরীরে। ফুটে উঠল ছবির পর ছবি। পূর্বজন্মের যত ঘটনা। সমস্ত কিছু সে স্পষ্ট দেখতে পেল।

* * *

প্রকাণ্ড এক বন। কীভাবে আগুন লাগল তাতে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চারদিক। লাল হল আকাশ। পশুরা প্রাণের ভয়ে ছোটাছুটি করল, পাখীরা এখানে ওখানে উড়ল। তারপর জড় হল নদীর ধারে! এক চিলতে জায়গা, দেখতে দেখতে ভরে গেল। সবাই হাজির সেখানে।

দল ছাড়া একটা হাতী সবশেষে পেঁছিল। পা রাখারও যেন জায়গা নেই। কোনরকমে একটি কোণে আশ্রয় নিল। তারপর পা চুলকোবার জন্য যেই না পা তুলেছে, সেই ফাঁকে একটা বাচ্চা খরগোশ সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল সেখানে।

কী আর করা যায়! হাতীর মনে বড্ড দয়া হল। মাটিতে পা রাখলেই খরগোশটা মারা যাবে। অতএব তিন-ঠেঙা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেক অনেকক্ষণ।

একটা সময় আগুন নিভে গেল। পশুপাখীরা ফিরে গেল বনে। হাতীটা এবার পা নামাতে চাইল। কিন্তু হায়, তার সে ক্ষমতা আর নেই। পা'টা একেবারে অসাড়। সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

তার ক্ষিদে-তেষ্টা মেটাবার সাধ্যি নেই। নদী এত কাছে, গাছপালাও বেশী দূরে নয়, কিন্তু, সে তো নড়তেই পারে না। একমাত্র ভরসা—যদি বৃষ্টি নামে। করুণ চোখে সে আকাশের দিকে তাকাল। কিন্তু কোথাও মেঘের দেখা নেই। সে বড় কাহিল হয়ে পড়ল। বড় অসহায় ভাবে তার মৃত্যু হল।

মহাবীর বললেন ঃ বৎস, আগের জন্মে তুমি ছিলে ঐ হাতী। একটা সামান্য খরগোসের জন্য তোমার মন কেঁদেছিল। তাই এ জন্মে রাজপুত্র হয়ে জন্মেছ। মেঘের জন্য হা-পিত্তেশ করেছিলে সেদিন। এজন্য পেয়েছ মেঘকুমার নাম।

মেঘকুমারের চোখদুটি ছলছল করছিল। সে ভাবল ঃ পশুর বুদ্ধি নিয়ে সে যদি ধৈর্য দেখাতে পারে, মানুষ হয়েই বা পারবে না কেন ?

মহাবীর শেষবারের মত প্রশ্ন করলেন ঃ মেঘকুমার, তুমি কি রাজপ্রাসাদে ফিরে যাবে ?

মহাবীরের পা' দুটি জড়িয়ে ধরল মেঘকুমার। কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ না-না।

মহাবীর উপদেশ দিলেন ঃ মুক্তি কারুর দয়ার দান নয়। সাধনার জোরেই তাকে আদায় করতে হবে। বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার বাহাদুরি কিছু নেই। নিজের সঙ্গে লড়াই করে যে জয়ী হয়েছে, সে-ই আসলে সুখী।

[গ্রন্থসাহিব ॥ প্রায় পাঁচশ বছর আগেকার কথা। ধর্মপ্রচারে নেমেছিলেন কয়েকজন মুসলমান পীর ও হিন্দু সাধু। ভারতের ইতিহাসে তাঁরা খুবই বিখ্যাত। তাঁরা বলতেন—সব মানুষই সমান, হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই, এবং ভক্তির জোরে ভগবানকে লাভ করা সহজ। এঁদের মধ্যে নিজামউদ্দিন আউলিয়া, মইনউদ্দিন চিসতি, কবীর, নানক ও মীরাবাঈ-এর নাম উত্তরাঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

গুরু নানক হলেন শিখধর্মের প্রবর্তক। শিখ কথাটির আসল অর্থ হল শিষ্য। নানক কোন জাতিভেদ মানতেন না। তাঁর মধ্যে ছিল না ধর্মের গোঁড়ামি। পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি মক্কা, বারাণসী, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেছিলেন। এর ফলে সবরকমের মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত। বাদশা আকবর শিখদের সম্মান জানিয়েছিলেন। তিনি দান করেছিলেন অমৃতসর গ্রামের একটি সরোবর ও একখণ্ড জমি। এখানেই গড়ে উঠেছে শিখদের প্রসিদ্ধ গুরুদ্বার বা স্বর্ণমন্দির।

নানক ছিলেন শিখদের প্রথম গুরু। আবার গোবিন্দ সিংহ হলেন দশম এবং সর্বশেষ গুরু। তিনি শিষ্যদের যুদ্ধবিদ্যা শেখার আদেশ দিয়েছিলেন। বলতেন—অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান উচিত। দীক্ষা দেবার পদ্ধতিও তিনিই চালু করেন। যারা দীক্ষা নিত, তাদের বলা হত খালসা অর্থাৎ পবিত্র। সকলের পদবী হল সিংহ। আরম্ভ হল পঞ্চ-'ক' প্রথা। সব শিখ ধারণ করল—কেশ (লম্বা চুল), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (ছোট জাঙ্গিয়া), কঙ্গা (চিরুনি), কড়া (লোহার বালা)। শিখদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুস্তকের নাম 'গ্রন্থসাহিব'। এতে রয়েছে গুরু নানক এবং অন্যান্য সাধুদের লেখা ভক্তিমূলক গান।]

পথের সন্ধানে

পাঞ্জাবের ছোট্ট একটি গ্রাম, নাম তালওয়ান্দি। সৌন্দর্য্যে যেন চোখ ফেরানো যায়। চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এখানে সেখানে ছোট-বড় টিলা। অনেকটা দূরে আরম্ভ হয়েছে মরুভূমির সীমানা।

সেই গ্রামেরই ছেলে নানক। কতটুকুই বা বয়েস। সবেমাত্র গজাচ্ছে পাতলা গোঁফের রেখা। কেমন যেন পাগলাটে ধরণের। লেখাপড়ার পাঠ চুকে গেছে কবে। ঘুরে বেড়াতেই তাঁর যত আনন্দ।
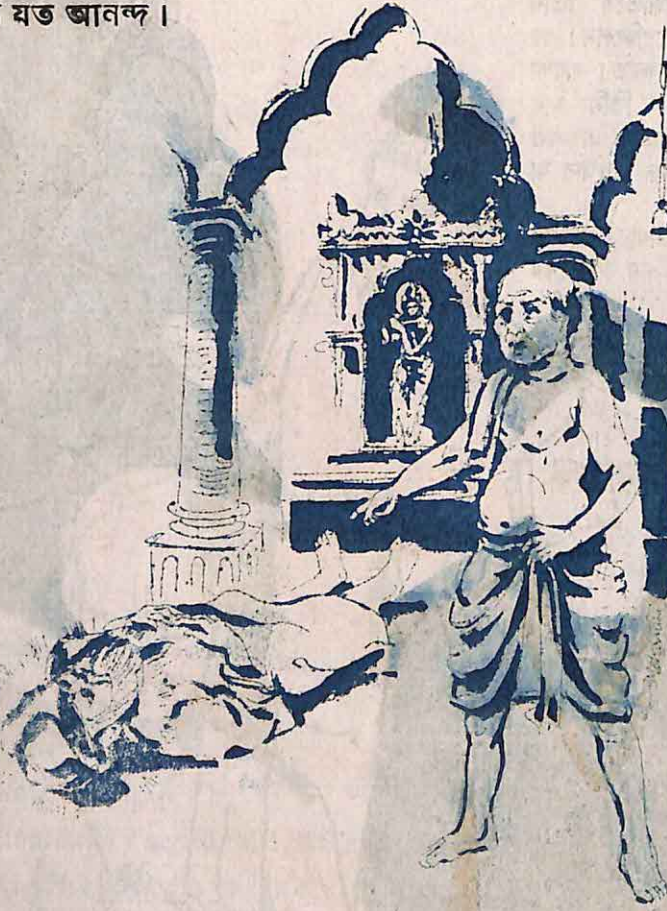
হরিণেরা ছোটাছুটি করছে। ঝোপের কাঠ-বিড়ালীরা লাফাচ্ছে। ডালের উপর নাচছে শালিখ, টিয়া আর কবুতরের দল। নানক এসব প্রাণভরে দেখেন। সারাটা দিন গান গেয়ে বেড়ান বনের পাখীর মত। সেই গান যে শোনে, তার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে।

মাঝে মাঝে হিসেব-নিকেশে বসতে হয়। সংসারের কত কাজ। নানক চাপা-গলায় বলেন: 'তেরা তেরা'। হে প্রভু, আমি তোমার, শুধু তোমারই। তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে জল গড়ায়। জমা-খরচের কথা ভুলে যান তিনি।

তারপর অনেক অনেক দিন কেটে গেছে। নানকের তখন প্রচুর নামডাক। মস্তবড় সাধু তিনি। আমীর-ওমরাহেরাও তাঁকে সম্মান জানায়। তিনি লেখাপড়া কিছুই শেখেননি। তবু তাঁর উপদেশ শুনবার জন্য দলে দলে লোক ছুটে আসত।

নানক প্রায়ই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। সেবারে পেঁছিলেন বিখ্যাত এক হিন্দু-মন্দিরে। তাঁর পরণে হলুদ রঙের আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি, আর গলায় স্ফটিকের মালা। বোধ হয় ক্লান্ত ছিলেন। তাই নাট-মন্দিরের একটি কোণে শুয়ে পড়লেন তখুনি।

হঠাৎ পুরোহিতের নজর নানকের ওপর পড়ল। পুরোহিত দেখলেন—মন্দিরের মূর্তি যেদিকে, ঠিক সেইদিকেই নানকের পা দু'টি বাড়ানো। নানক ঘুমাচ্ছেন নিশ্চিন্ত মনে, কোন হুঁশ নেই।

পুরোহিতের মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। এ যে জেনেশুনে দেবতাকে অপমান করা! রুক্ষ গলায় গালাগাল দিলেন: তোমার আক্কেলটা কিরকম শুনি! তোমাকে ধার্মিক বলেই ভেবেছিলাম, এখন দেখছি তুমি পয়লা নম্বরের নাস্তিক। পা মেলেছ দেবতার দিকে। তোমার সাহস তো কম নয়।

নানকের ঘুম ভেঙে গেল। মুচকি হেসে বললেন: আমার কতটুকুই বা জ্ঞান। আপনাদের কাছে শিশু। বেশ তো! কোনদিকে দেবতা নেই, আমাকে দেখান। না হলে সেদিকেই পা রাখবো।

এবারে পুরোহিতের টনক নড়ে উঠল। একথার কী উত্তর দেবেন? অতএব মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

* * *

নানক বলতেন! পৃথিবীর সব কিছু গড়েছেন ভগবান। তিনি নিরাকার। তবুও তিনি আকার নিয়েছেন নিজেরই সৃষ্টির ভেতর। আমি তাঁর মহিমা গেয়ে বেড়াই। আমি দেখেছি, আজ দেশে একটিও হিন্দু নেই, নেই কোন মুসলমান।

কথাটা কাজীর কানে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নানককে ডেকে পাঠালেন। বললেন: হিন্দুর ঘরে তোমার জন্ম। নিজেদের নিয়ে যা কিছু বল, আমার আপত্তি নেই। তাই বলে, মুসলমানদের নিয়ে হালকা কথাবার্তা আমি সহ্য করব না।

ধীরে ধীরে নানক জবাব দিলেন: সত্যি করে বলুন তো, পয়গম্বরের উপদেশ মেনে চলছে কজন?

কাজী একটুখানি থতমত খেলেন। কপাল কুঁচকে বললেন: তোমায় বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা নানক, তুমি কোন ধর্মের লোক?

নানক উত্তর দিলেন: যিনি পরমপুরুষ, তাঁর দেখান আলোতেই আমি পথ চলি। আমার চোখে হিন্দু-মুসলিম কোন ভেদাভেদ নেই।

এবারে কাজী একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন: বেশ তো, আমরা এখন মসজিদে যাচ্ছি। তুমি কি আমার সাথে নামাজ পড়তে রাজী?

সঙ্গে সঙ্গে নানক বললেন ঃ নিশ্চয়ই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব, এর চেয়ে কি বড় সৌভাগ্য আছে!

* * *

এক সময় নামাজ পড়া শেষ হল। সারাটা সময় নানক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। বিরক্ত হয়ে কাজী শুধালেন ঃ কই, তুমি তো আমাদের সাথে যোগ দিলেনা। দেখছি, তোমার কথার কোন দাম নেই।

নানক বললেন ঃ আপনার সাথে সাথেই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি নিজেই তো নামাজ পড়েন নি।

সকলের সামনে এ কী কথা! কাজী ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। চীৎকার করে উঠলেন ঃ মুখ সামলে কথা বল।

নানক বুঝিয়ে দিলেন ঃ আপনার বাড়ীতে একটা ঘোড়ার বাচ্চা জন্মেছে দিন কয়েক আগে। কুয়োতলায় সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পাছে ওটা পড়ে যায়, এতক্ষণ সেই কথাই ভাবছিলেন। বলুন তো কাজী সাহেব আপনি কি মন দিয়ে নামাজ পড়েছিলেন?

খুবই আশ্চর্য হলেন কাজী। কথাটা তো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নানক কি তবে অপরের মনের কথাও টের পান? নানকের ওপর কাজীর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন।

নানক ফিরে চললেন গ্রামের পথে। মধুমাখা গলায় গাইলেন ঃ ভগবান রয়েছেন সব জায়গাতে। আকুল হয়ে তাঁকে ডাকো, তবেই তো ঘুচবে দুঃখ। সদ্‌গুরুই আমাদের সহায়। তিনি দেখান পথ, তিনিই আনেন সুখ।

[**বাইবেল** ।। ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছিলেন প্রায় দু'হাজার বছর আগে। তাঁর জন্মদিন হল ২৫ ডিসেম্বর। তাই এর নাম 'বড়দিন'। বেথেলহাম শহরে হাড়কাঁপানো শীতের রাতে যীশু ভূমিষ্ঠ হন। সেই রাতে মাতা মেরী আশ্রয় নিয়েছিলেন এক সরাইখানার আস্তাবলে। যীশু শব্দের প্রকৃত অর্থ হল 'মুক্তিদাতা'। তিনি বলতেন: 'যদি কেউ তোমায় একগালে চড় মারে, তবে তার দিকে অন্য গালটিও বাড়িয়ে দিও।' তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন, পাপীকে নয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিল বারো জন। এদের মধ্যে একজন করল বিশ্বাসঘাতকতা। যীশুকে তুলে দিল শত্রুদের হাতে। তিনি পেলেন নিদারুণ যন্ত্রণা। তিনি প্রাণ দেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। তার আগে শুধু একবার বললেন: 'এরা কী করছে, তা জানে না। হে পিতা, তুমি এদের ক্ষমা করো'।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যে ধর্ম প্রচার করেন, সে ধর্মের নাম খ্রীষ্টধর্ম। খ্রীষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম—'বাইবেল'। গ্রীক শব্দ বাইবেলের অর্থ হল—শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বাইবেলের দুটি ভাগ। খ্রীষ্টের আর্বিভাবের পূর্বে লেখা হয়েছে 'ওলড টেস-টামেন্ট' বা পুরাতন নীতি। আর তাঁর আর্বিভাবের পরে লেখা হয়েছে 'নিউ টেস-টামেন্ট' বা নতুন নীতি। যীশুর জীবনকথা ও উপদেশে ভরা আছে এই দ্বিতীয় অংশ। এই গল্পটি কিন্তু প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে বাইবেল।]

সোলমানের বিচার

সোলমানের বিচার

বহু বহু বছর আগেকার কথা।

সে সময় সোলমান ছিলেন ইস্রায়েল দেশের রাজা। প্রজাদের তিনি ভালবাসতেন প্রাণ দিয়ে। সর্বদা নজর রাখতেন তাদের সুখ সুবিধার দিকে। রাজা সোলমান সকলের মন জয় করেছিলেন। ভগবানকে আরাধনা করতেন নিজের পিতার মত। প্রজাদের স্নেহ করতেন আপন পুত্রের মত।

এর ফলে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল রাজার সুনাম।

একদিন রাতের বেলায় সোলমানকে দেখা দিলেন ভগবান। অপূর্ব এক জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ল সেখানে। সোলমান ভাবতেও পারেন নি, এত সৌভাগ্য তিনি পাবেন। পরম শ্রদ্ধায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন তিনি।

ভগবান বললেন ঃ আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি সোলমান। তুমি আমার কাছে বর চাও। তুমি যা চাইবে, তাই দেব আমি।

বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন সোলমান। ধীরে ধীরে বললেন ঃ প্রভু, তুমিই আমায় রাজা করেছ। কিন্তু আমার কোন জ্ঞান নেই। আমি বালকের মত। তোমার তো দয়ার শেষ নেই। আমাকে জ্ঞান দাও। আর ঐ সাথে দাও বিচার-বুদ্ধি।

আবার কথা বললেন ভগবান। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সোনাদানা আর মণিমুক্তোকে বলা হয় ঐশ্বর্য। জ্ঞান এবং ঐশ্বর্যের মধ্যে তুমি কোনটি চাও ?

মাথা নত রেখে সোলমান জবাব দিলেন। বললেন ঃ প্রভু, আমি যেন ভাল ও মন্দের তফাৎ বুঝতে পারি। এই ক্ষমতা আমায় দাও। তোমার কৃপা পেলে প্রজাদের সুখী করব আমি।

এই কথা শুনে খুবই খুশী হলেন ভগবান। সোলমানকে আশীর্বাদ জানালেন দু'হাত তুলে। বললেন ঃ তুমি ঐশ্বর্য চাও নি। চেয়েছ শুধু জ্ঞান। প্রমাণ হয়ে গেল, তুমি কত বড়। অতএব, আমি তোমাকে দু'টোই দেব। ঐশ্বর্য এবং জ্ঞান।

* * *

কিছুদিন পরের কথা।

সিংহাসনে বসে আছেন রাজা সোলমান। দরবারে হাজির হল দু'টি মেয়ে। তারা চায় বিচার। এতক্ষণ প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছিল নিজেদের মধ্যে। রাজার কাছে এসে কিছুটা শান্ত হয়েছে তারা এখন।

এক ফোঁটা একটি শিশুকে নিয়ে এসেছে ওরা। একেবারে দুধের বাচ্চা। এই বাচ্চাটিকে নিয়েই যা কিছু ঝগড়া। সে ঝগড়া যেন মিটতে চায় না।

রাজা শুনতে আরম্ভ করলেন ওদের কথা।

রাগে গর গর করছিল একটি মেয়ে। সে বলতে থাকল ঃ আমরা দু'জনে থাকি একই ঘরে। গভীর রাতে ওর ছেলেটি মারা যায়। সে সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই ফাঁকে আমার জীবন্ত ছেলেকে ও বদলে নিয়েছে। ওর মরা ছেলে রেখেছে আমার বিছানায়। আর নিজের কোলে নিয়েছে আমার জীবন্ত ছেলে।

এবার সোলমান অন্য মেয়েটির দিকে তাকালেন। শুধু বললেন ঃ তোমার কথা শুনতে চাই আমি! অন্য মেয়েটি বলতে লাগল ঃ জীবন্ত ছেলেটি এখানে হাজির রয়েছে। আমিই ওর আসল মা। আমার কোলে ওকে তুলে দিন হুজুর।

এরপর সুরু হল তুমুল তর্ক। দু'টি মেয়ে বলল একই কথা। আঙুল তুলে দু'জনেই বলল ঃ ও মিথ্যুক আর চোর। ওকে সাজা দিন আপনি।

বাচ্চাটি কথা বলতে শেখেনি তখনো। মাত্র কয়েক দিন আগে জন্মেছে সে। তার সত্যিকার মা কে—একথা মীমাংসা করা মুশকিল।

রাজা সোলেমান কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর একজন প্রহরীকে হুকুম দিলেন ঃ একটা ধারালো তরবারি নিয়ে এস এখুনি।

তখুনি তরবারি নিয়ে এল প্রহরী। গম্ভীর কণ্ঠে রাজা বললেন ঃ তরবারির এক কোপ লাগাও বাচ্চার ওপর। ঠিক মাঝখানে। বাচ্চাটিকে ভাগ কর সমানভাবে। প্রত্যেককে দাও এক এক খণ্ড।

রাজার আদেশ শুনে একটি মেয়ে রাজী হয়ে গেল। তার মুখে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

মাথা নাড়তে নাড়তে সে জানাল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন হুজুর।

অন্য মেয়েটি কিন্তু রাজার পায়ে আছড়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল ঃ দোহাই আপনার! দুধের বাচ্চাকে এমনভাবে মারবেন না হুজুর। ওকেই বরং ছেলেটি দিন। বাচ্চা আমার বেঁচে থাকবে।

রাজা সোলেমান অবশেষে বললেন ঃ আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। তুমিই বাচ্চার আসল মা। যে সত্যিকারের মা, সে কখনো ছেলেকে মেরে ফেলতে চাইবে না। সবসময় চাইবে ছেলের মঙ্গল।

রাজার আদেশে ছেলেকে তুলে দেওয়া হল আসল মায়ের কোলে। পৃথিবীর সবাই জানল ঃ ঐশ্বর্যের চেয়েও জ্ঞান অনেক অনেক বড়।

[**কোরআন শরীফ ॥** কোরআন শরীফ কথাটির অর্থ হল—'আল্লাহ'র বাণীর সংকলন। মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। মক্কার কাছাকাছি হেরা পর্বতের গুহায় হজরত মহম্মদ একবার ধ্যানমগ্ন হন। দেবদূত জিব্রাইল আল্লাহ'র নিকট হতে বাণী নিয়ে সেসময় হজরতের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। কোরআন পাঠের সময় 'আউজোবিল্লাহ' এবং 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করার নির্দেশ আছে। প্রথম কথাটির অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে ঈশ্বরের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর দ্বিতীয় কথাটির অর্থ: অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করছি। কোরআনে মোট বাক্য আছে ছ'হাজার ছ'শ ছেষট্টি। রোজার মাসে সমগ্র কোরআন পড়া বা শোনা আবশ্যক। তাই একে ত্রিশ খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে।

হজরত মহম্মদ এ ধরায় জন্ম নিয়েছিলেন চৌদ্দশ বছরের সামান্য কিছু আগে। তাঁর প্রচারিত ধর্ম 'ইসলাম ধর্ম' নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বলতেন—'সব মানুষই সমান তারা কেউ ছোটবড় নয়। আল্লাহ্ এক তিনি মহান। তাঁর কোন আকার নেই, তিনি সর্বশক্তিমান'। হজরতের জীবনে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময় ও স্থানে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছিল। যখনই কোন বাণী হজরতের নিকট পৌঁছে যেত, তখুনি কোন শিষ্য তা মুখস্থ রাখতেন অথবা লিখে ফেলতেন। চল্লিশজন বিখ্যাত শিষ্য এই পবিত্র কাজে নিযুক্ত ছিলেন। আরবী ভাষায় লেখা হয়েছিল এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। মানুষের জীবনে এমন কোন দিক নেই, যেখানে পবিত্র কোরআন আলোকপাত করেনি।]

প্রথম কোরবানী

সে অনেক অনেক কাল আগেকার কথা।

আরবদেশে এক ঈশ্বরভক্ত বাস করতেন, তাঁর নাম ইব্রাহিম। অত বড় ঈশ্বরভক্ত সে যুগে আর কেউ ছিলনা। তিনি সবাইকে বোঝালেন: দেশের রাজা নয়, ভগবানই সর্বশক্তিমান। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকলের উপরে। মূর্তিপূজোর বদলে করা উচিত আল্লাহর উপাসনা।

ইব্রাহিমের দুজন স্ত্রী—সারা এবং হাজেরা।

কিছুদিন বাদে হাজেরার কোলে এল একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। তার নাম রাখা হল ইসমাইল।

সারার কোন ছেলেমেয়ে ছিলনা। তাই সে হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। মুখ গোমড়া করে সে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিছুতে তার মুখে আর ফুটল না।

ব্যাপারটা ইব্রাহিমের নজরে পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কি হয়েছে সারা?

সারা স্পষ্টাস্পষ্টি জানালেন: সতীন আর তার ছেলে আমার দু'চক্ষের বিষ। দূরে বহুদূরে ওদের সরিয়ে দাও। নইলে আমার শান্তি নেই।

কথা শুনে চমকে উঠলেন ইব্রাহিম। মনে মনে খুবই দুঃখ পেলেন। কিন্তু কি আর করেন! মনের দুঃখ মনে চেপে রাখলেন। তারপর নিয়ে চললেন বিবি হাজেরা আর ছোট্ট একরত্তি ছেলে ইসমাইলকে, বহুদূর মরুভূমির মাঝখানে।

মরুভূমির ঠিক মাঝখানটিতে বৌ আর ছেলেকে রাখলেন ইব্রাহিম। সঙ্গে দিলেন সামান্য কিছু খাবার দাবার, আর তেষ্টা মেটানর একটুখানি জল। ওদের ছেড়ে দিয়ে ফিরে এলেন তারপর। শুধু মনে ভাবতে থাকলেন: ভগবানের কী ইচ্ছে তিনিই জানেন। তাঁর উপর ভরসা রাখতে হবে। এছাড়া অন্য উপায় নেই।

* * *

ধূ ধূ মরুভূমি! বালির পর বালি, শুধু বালি। জনপ্রাণী কেউ কোথাও নেই। খাঁ খাঁ চারদিক। দুধের বাচ্চাকে বুকে চেপে ধরল হাজেরা। তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। সে বহুক্ষণ কাঁদল।

তারপর এক সময় মনটাকে শক্ত করে উঠে বসল। দেখতে দেখতে দু-একটা দিন কেটে গেল। ঐ একটুখানি খাবার আর তেষ্টার জলও ফুরাল বেশ তাড়াতাড়ি।

হাজেরা এবার একেবারেই ভেঙে পড়ল। কী অসহায় অবস্থা। একজনও সাহায্য করার নেই। আর যাই হোক, দুধের বাচ্চাকে সে বাঁচাবে কীভাবে? ইসমাইল তখন কেঁদেই চলেছে। তেষ্টায় যেমন ছাতি ফেটে যায়।

হাজেরার চোখে পড়ল, দূরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি পাহাড়—সাফা, আর মারওয়া। হাজেরাকে এবার শেষ চেষ্টা চালাতে হবে। ঐ পাহাড়ের কোথাও কোন খাবার পাওয়া যায় কিনা, তেষ্টার জল পাওয়া যায় কিনা, খুঁজে দেখতে হবে। কোলের বাচ্চাটি একলাটি শুইয়ে রেখে সে ছোটাছুটি আরম্ভ করল।

হন্তদন্ত হয়ে সে দৌড়াদৌড়ি করল। এক আধবারও নয়। এ পাহাড়ে ও পাহাড়ে পাক্কা সাতবার। কিন্তু তবুও কোন কিছুর হদিশ পেলনা। হতাশ হয়ে সে ফিরেই এল।

ফিরে আসামাত্র তার চোখে পড়ল আশ্চর্য এক কাণ্ড। ভগবানের অসীম দয়া। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করা যায়না। হাজেরা দেখল—ইসমাইল হাত-পা নেড়ে মনের সুখে খেলছে। আর বাচ্চার ঠিক পায়ের কাছে টলটল করছে জলের ফোয়ারা। শুকনো মরুভূমির বুকে হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। এর নাম জমজম।

মা ও ছেলে তেষ্টা মেটাল। ঠাণ্ডা হল শরীর। ঠিক এই সময়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একদল বিদেশী সওদাগর। জায়গাটা তাদের ভারী পছন্দ হয়ে গেল। তারা বসতি গাড়ল। আস্তে আস্তে রাস্তাঘাট তৈরী হল, ঘরবাড়ী উঠল, বাজারহাট বসল। এইভাবে যে শহর পত্তন হল, তার নাম মক্কা।

আজো আছে দুটি পাহাড়—সাফা আর মারওয়া। আছে সেই কতকালের ফোয়ারা জমজম। এখনো যারা মক্কায় হজ করতে যান, তারা ভাবেন মা ও ছেলে হাজেরা আর ইসমাইলের দুঃখের ঘটনা। সেইসব কথা ভেবে হজযাত্রীরা সাতবার পাহাড়ে ওঠানামা করেন। আর তেষ্টা মেটান ফোয়ারার পবিত্র জলে।

* * *

কেটে গেল বেশ কিছুদিন। খোদাতালার দয়ায় শিশু ইসমাইল বড় হয়ে উঠল। ইব্রাহিম তাদের ভুলে যাননি। খোঁজখবর নিতেন। ছেলেকে আদরযত্ন করতেন। ইসমাইল এখন তাঁর নয়নের মনি।

এক রাত্রে ইব্রাহিম স্বপ্ন দেখলেন। আল্লাহ'র আদেশ ঃ কোরবানী কর।

ভগবানের আদেশ মাথা পেতে নিতে হবে। সকালে উঠেই বলি দেওয়া হল একশ উট।

সেই রাত্রে আবারো স্বপ্ন। ঈশ্বরের আদেশ ঃ কোরবানী কর। পরদিন সকালে বলি দেওয়া হল একশ উট।

কিন্তু হায়! ইব্রাহিম আবার স্বপ্ন দেখলেন। ঈশ্বরের আদেশ ভেসে এল একই-রকমভাবে। আল্লাহ জানালেন ঃ তুমি সবচেয়ে যাকে বেশী ভালবাস, যা তোমার সব চাইতে প্রিয়বস্তু, তাকেই কোরবানী দাও।

ইব্রাহিম ভাবলেন, নিজের ছেলেই তো সবচেয়ে প্রিয়। অতএব তারই কোরবানী হবে এবার। নিজের মনকে দৃঢ় করলেন তিনি।

ঘাপটি মেরে কোথায় লুকিয়ে ছিল শয়তান ইবলিস। তার কাজ মানুষকে ভুলপথে চালান, আর খারাপ পরামর্শ দেওয়া। সে এবার কাজে লেগে পড়ল। মায়ের কানে কথাটা তুলল এক ফাঁকে।
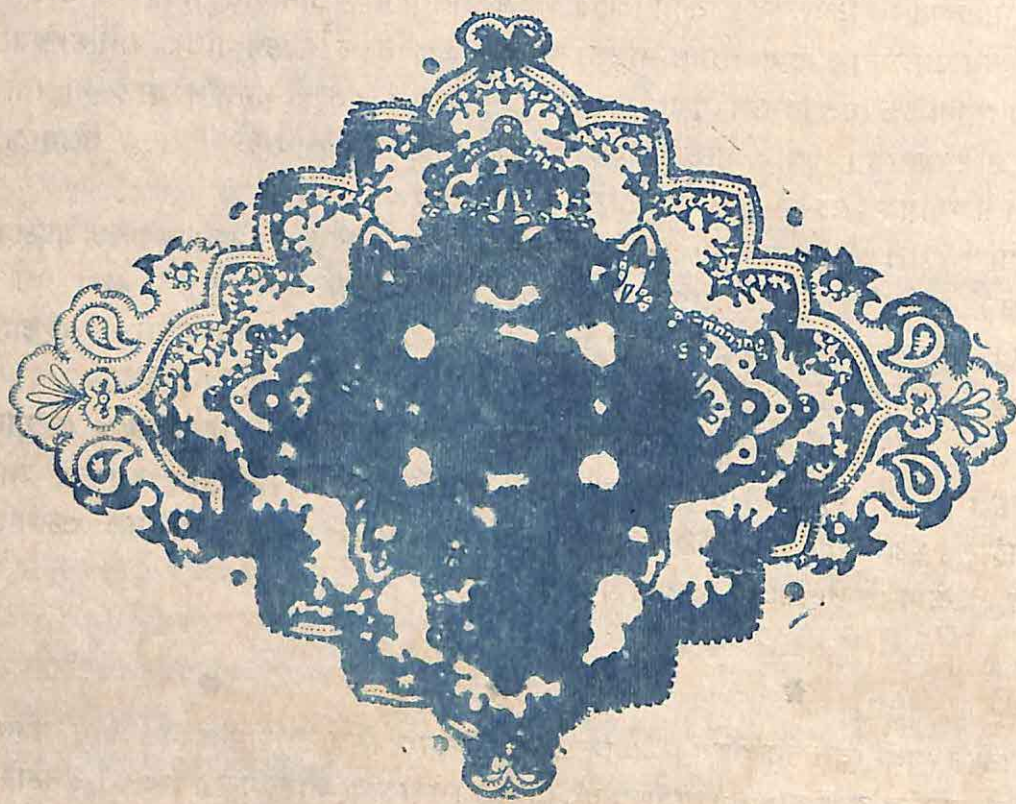
বিবি হাজেরা কিন্তু নিজের ছেলেকে সাজালেন সুন্দরটি করে। ছেলেও বেজায় খুশী। শয়তানকে আমল না দিয়ে হাজেরা বললেন ঃ খুব আনন্দের কথা। আল্লাহ'র আদেশে কে বানী হওয়া, এ যে মস্তবড় সৌভাগ্য।

বাপ-ছেলেতে পৌঁছে গেলেন মীনা ময়দানে। ছেলেকে সব কথা খুলে বললেন বাবা। এতটুকুও ভয় পেলনা ছেলে। বরং সে বলল ঃ আপনি আল্লাহ'র হুকুম মানুন।

ইব্রাহিম নিজের পাগড়ি ছিঁড়ে ছেলের চোখ বাঁধলেন। যদি মায়া হয়, যদি হাত কাঁপে! তাই এ ব্যবস্থা। এবারে আল্লাহ'র নাম নিয়ে ছেলের গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু জবাই হল না।

তখন ছেলে ইসমাইল বলল ঃ আপনি নিজের চোখদুটোকেও বেঁধে ফেলুন আব্বাজান।

ইব্রাহিম দেখলেন, সত্যি তো! ছেলে ঠিকই ভুল ধরিয়েছে। নিজের ছেলের মুখ দেখলেই প্রাণটা কেঁদে উঠবে। এভাবে কি তার গলায় ছুরি বসান যায়!

অতএব ছেলের কথামত কাজ হল। ইব্রাহিম নিজের চোখদুটো বাঁধলেন, আর ছুরি চালালেন। একেবারে নিখুঁত সুন্দরভাবে কোরবানী শেষ হল।

তারপর চোখের কাপড় খুলতে দেখা গেল, সে এক আশ্চর্য অপূর্ব কাণ্ড।

দেবদূত জিব্রাইল তখন বাপ-ছেলেকে সেলাম জানাচ্ছেন। ইসমাইল দাঁড়িয়ে আছে দিব্যি সুস্থ শরীরে। ওখানটিতে পড়ে রয়েছে জবাইকরা একটা দুম্বা। ইসমাইলের বদলে কোরবানী হয়েছে তার।

এই ঘটনা থেকেই কোরবানী প্রথা ছড়িয়ে পড়ল। জিব্রাইল মধুরকণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহ সন্তুষ্ট। তিনি কোরবাণী গ্রহণ করেছেন। সব চাইতে প্রিয়বস্তু আল্লাহ'র কাছে উৎসর্গ করাই আমাদের পরম কর্তব্য।

শক্তিময়ী দুর্গা

[পুরাণ ॥ পুরাণ কথাটির মানেই হল পুরাতন। আগেকার দিনের ভুলে যাওয়া ঘটনাকে হয়তোবা এইভাবে লিখে রাখা হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে আবার খাঁটি ইতিহাস বলা যায় না। যাই হোক, মোট ১৮ টি পুরাণের কথা আমরা শুনে থাকি। সবগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। অসংখ্য গল্প ছড়িয়ে আছে এদের মধ্যে। তবে কে যে আসলে লিখেছেন, তা জানা যায়না। যেসব পুরাণ খুবই বিখ্যাত, তাদের নাম—শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদি।

বৈষ্ণবেরা ভাগবতকে সবচেয়ে উঁচু আসনে বসায়। ঠিক তেমনি শাক্তদের কাছে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনেক বেশী দামী। পণ্ডিতেরা বলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণ লেখা হয়েছিল হাজার বছর আগে। মহাভারতের মধ্যে আছে গীতা, মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে চণ্ডীস্তোত্র। একদা গ্রামে গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপ থাকত। চণ্ডীপাঠ হত প্রতিদিন। ভগবানকে আমরা মায়ের রূপে দেখি। ওদিক থেকে বাঙ্গালীরা যেন একটুখানি আলাদা। দুর্গাপূজাই বাংলার জাতীয় উৎসব। মহামুনি মার্কণ্ডেয় এইসব গল্প শুনিয়েছিলেন, সেজন্য বইটির নাম—মার্কণ্ডেয় পুরাণ।]

কতকাল আগের কথা।

গভীর বনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন দুজন। হঠাৎ দেখা। একজনের নাম সুরথ, অন্যজন সমাধি সুরথ হলেন রাজা, আর সমাধি ব্যবসাদার। দুজনের মনে দারুন দুঃখ। এরপর হাঁটতে হাঁটতে একটি আশ্রমের ধারে ওরা পেঁছিলেন। আশ্রমের যিনি ঋষি, তাঁর নাম মেধস।

মেধস জিজ্ঞেস করলেন ঃ দেখতে পাচ্ছি, তোমরা দুজনে বড় মুষড়ে পড়েছ। কেন বল তো ?

সুরথ জবাব দিলেন ঃ শত্রুদের কাছে আমি যুদ্ধে হেরে গেছি। পালিয়ে এসেছি বনে। তবু শান্তি খুঁজে পাচ্ছি-না। যে প্রাসাদে আমি বাস করতাম, তার কী ছিরি হয়েছে কি জানি! চাকর-বাকরেরা কি আমাকে ভুলে গেছে ? একটি হাতীকে বড় ভালোবাসতাম তার কথাও মনে হয়।

সমাধি জানালেন ঃ আমার স্ত্রী আর ছেলেপুলেরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। পয়সা কড়িও কেড়ে নিয়েছে। অথচ কী আশ্চর্য, ওদের জন্য মনটা বড় অস্থির। ওদের কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি তো ? ভাবনা-চিন্তায় ঘুম আসছে না।

মেধস বললেন ঃ এর নাম মায়া।

সুরথ ও সমাধি জানতে চাইলেন : কেন এরকম হচ্ছে ? তার কারণ কি ?

ঋষি বোঝালেন : পশুপাখিরাও খায়দায়, বাসা বাঁধে, বাচ্চাকাচ্চা আগলে রাখে। কিন্তু এটাকে সত্যিকারের জ্ঞান বলা যায় না। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের মনে মায়া ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অতএব মায়া যদি কাটাতে চাও, দেবী মহামায়ার পূজো কর। সংসারের জালে তিনি আমাদের বন্দী করেছেন ঠিকই। আবার তিনিই মুক্তি দিতে পারেন।

ঋষি বলে চললেন : জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি ছড়িয়ে আছেন। তাঁর কোন চেহারা নেই। আবার কখনো কখনো চেহারা ধরেছেন তিনি।

এবার সুরথ আর সমাধির আগ্রহ বাড়ল। তখন মহর্ষি মেধস গল্প বলা আরম্ভ করলেন—

* * *

পুরাকালে দারুণ যুদ্ধ বেধেছিল একবার। একদিকে দানবেরা অন্যদিকে দেবতার দল। দেবতাদের রাজা ইন্দ্র, আর দৈত্যদের রাজার নাম মহিষাসুর। মহিষাসুরই যুদ্ধে জিতে যান। স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। প্রচণ্ড অত্যাচার চালায়। দেবতারা ভয়ে পালিয়ে যান।

এরপর দেবতারা কাতর প্রার্থনা জানালেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবকথা শুনলেন। ভীষণ রাগ হল। শরীর থেকে বেরুতে থাকল তেজ। সেই তেজ সব এক জায়গায় জড় হল। দেখা গেল, একজন দেবী দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। তিনিই দুর্গা। চণ্ডী নামেও আমরা তাঁকে ডেকে থাকি। গহনাগাটি আর কাপড়চোপড় দিয়ে তাঁকে সাজানো হল। দেওয়া হল নানা রকম অস্ত্র। তিনি চড়ে বসলেন সিংহের উপর। দেবীর অট্টহাসি শোনা গেল বারবার। কেঁপে উঠল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।

দেবী মাঝেমাঝে নিশ্বাস ছাড়ছিলেন। সেই নিশ্বাস থেকে জন্ম নিল লক্ষ লক্ষ সৈন্য-সামন্ত। ভূতপ্রেতের দলও জুটে গেল সেখানে। সবাইমিলে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল। অসুরদের কেটে ফেলল। সিংহেরও কেশর ফুলে উঠল। দাঁত দিয়ে কামড়ে শত্রুদের ফালাফালা করল। দৈত্যরা বাধা দিতে পারল না। তখন মহিষাসুর লড়াইয়ের নামল! সে কখনো মহিষ হচ্ছিল, আবার কখনো বা অসুর। যেমন খুশী চেহারা পালটাচ্ছিল। প্রচণ্ড গর্জনে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল।

দুর্গা লাফিয়ে উঠলেন অবশেষে। মহিষাসুরের ঘাড়ে পা রাখলেন। মহিষের মুখ থেকে বেরুল মহিষাসুরের আর্ধেকটা শরীর। তাকে ত্রিশূল দিয়ে বিঁধলেন দেবী। খড়্গের আঘাতে মহিষাসুরের মুণ্ডু গড়িয়ে পড়ল। দৈত্যরা হাহা—কার করতে থাকল। দেবতারা আনন্দে অধীর। গন্ধর্বরা গাইল, অপ্সরারা নাচল।

* * *

দেবতারা আরো একবার বিপদে পড়েছিলেন। সেবার স্বর্গ দখল করেছিল দুজন দৈত্য। তারা ছিল দু'টি ভাই। তাদের নাম শুম্ভ আর নিশুম্ভ। ওরাও দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া লাঞ্ছনা করত, অপমানও করত।

নিজেদের ক্ষমতা কুলাল না। অতএব, দেবতারা মনে মনে দুর্গাকে ডাকলেন। হাত জোড় করে বললেন ঃ আমাদের দুর্গতির শেষ নেই। মা, মাগো, তুমি রক্ষা কর। যার যতটুকু শক্তি, সে তো তোমারই দান। তোমায় প্রণাম।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

দুর্গা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সকলের সামনে এলেন। কী অপরূপ উজ্বল মূর্তি! তাঁকে দেখে শুম্ভ আর নিশুম্ভের মাথা ঘুরে গেল। দেমাক দেখিয়ে বললে ঃ তোমাকে পাটরানী করতে চাই। রাজী আছ তো?

দুর্গা মুচকি হেসে বললেন ঃ যে আমায় যুদ্ধে হারাবে, তাকেই বিয়ে করব। এই হল প্রতিজ্ঞা।

দৈত্যরাজ খুবই ক্ষেপে গেল। একজন চেলাকে ডাকল। তার নাম ধূম্রলোচন। হুকুম দিল : মেয়েটার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে এস।

দেবী শুধু কটমট করে তার দিকে তাকালেন। ধূম্রলোচন পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এবার হাজির হল ভয়ঙ্কর দৈত্য দুজন। তাদের নাম চণ্ড আর মুণ্ড। দেবী ভুরু কুঁচকালেন। মুখ কালো হয়ে উঠল রাগে। এ যেন নতুন চেহারা দেবীর। কালী তাঁর নাম। হাতে খড়্গ, পরনে বাঘছাল, গলায় মাথার খুলি। জিব বার করে রেখেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে খতম হলেন চণ্ড আর মুণ্ড।

দৈত্যদের নতুন সেনাপতি এসে দাঁড়াল এবার। রক্তবীজ তার নাম। তার শরীর থেকে যদি এক ফোঁটা রক্ত নীচে গড়িয়ে পড়ে, অমনি হাজার হাজার সৈন্য মাটি ফুঁড়ে বেরোয়। গদার ঘা মেরে তার মাথা ফাটালেন দেবী। যত রক্ত গড়াল, এতটুকুও মাটিতে পড়তে দিলেন না। সবটুকু ঢক ঢক করে গিললেন। রক্তবীজের জারিজুরি খাটল না। তখুনি মরে গেল।

সব শেষে শুম্ভ আর নিশুম্ভের পালা। তাদেরও বধ করলেন দেবী। স্বর্গরাজ্য ঝলমল করে উঠল আগেকার মত। দেবতারা স্তব আরম্ভ করলে : মা, মাগো! অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়ায়, তখনই তোমায় ডাকি। তুমি শক্তি জোগাও। শত্রুদের তাড়াও। তুমি আমাদের মঙ্গল করেছ। তোমায় প্রণাম!

সর্বমঙ্গল–মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

* * *

মহর্ষি মেধসের গল্প বলা শেষ হল। তারপর সুরথ ও সমাধি মহাদেবীর পূজোয় বসলেন। ঢেলে দিলেন অন্তরের সবটুকু নিষ্ঠা। দুর্গা দেখা দিলেন। বললেন : তোমাদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।

রাজা সুরথ বললেন : রাজত্ব উদ্ধার করতে চাই। চাই ধনদৌলত, সুখ–আহ্লাদ।

বৈশ্য সমাধি বললেন : মায়ার বাঁধন থেকে মুক্তি চাই। চাই সত্যিকারের জ্ঞান।

দেবী দুর্গা হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন : তথাস্তু!

তুচ্ছ এক সঙ্গী :

১। 'পঞ্চতন্ত্র' কোন ভাষায় লেখা ? কতবছর আগে লেখা হয়েছিল ? এই বিখ্যাত বইটিতে ক'টি ভাগ রয়েছে ? মহিলারোপ্য নগরের রাজার মনে সুখ ছিল না কেন ? অবশেষে মন্ত্রীর পমরার্শে তিনি কার সাহায্য নিলেন ?

২। 'দূর পথে একা একা না যাওয়া ভাল। আর কেউ যখন নেই, এটাকেই তুই সঙ্গী করে নে'—ছেলের সঙ্গী হিসেবে মা কাকে বেছে দিয়েছিলেন ? ছেলে কোথায় যাচ্ছিল ? মায়ের কথা শুনে সে সঙ্গীকে কোথায় রাখলো ?

৩। 'ছেলেটি নেতিয়ে পড়ল ঘুমে। আর গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক সাপ' —ছেলেটির প্রাণ কিভাবে রক্ষা পেলো ? ঘুম ভাঙার পর সে কি দেখলো ? এর ফলে কি শিক্ষা লাভ করলো ?

রূপের চেয়ে গুণ বড় :

১। ঈশপ কোন দেশের মানুষ ? পশুপাখি নিয়ে লেখা তাঁর গল্পগুলিকে কি বলা হয় ? ঈশপ সম্বন্ধে যতটুকু জান লিখ ?

২। হরিণের ছায়া পড়লো ঝরণার জলে। নিজের চেহারা দেখে তার একবার গর্ব হলো, আবার দুঃখ হলো। গর্ব হলো কেন ? দুঃখই বা হল কেন ?

৩। বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণ কি করলো ? শেষ পর্যন্ত তার কি দশা হলো ? সে কি বলে আক্ষেপ করেছিলো ?

বিড়াল তপস্বী :

১। হিতোপদেশ কোন ভাষায় লেখা ? গল্পগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য কি ? বিদ্যাকে সকলের সেরা বলা হয় কেন ?

২। পাকুড় গাছে যে বুড়ো শকুন বাস করতো তার নাম কি ? যে ধূর্ত বিড়াল সেখানে এসেছিল তারই বা নাম কি ? শকুন কিভাবে খাবার জোটাতো ? বিড়াল কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল ? বিড়ালটা কিভাবে শকুনকে ছলাকলায় ভুলিয়ে রাখলো ?

৩। ছানাগুলোকে সাবাড় করার পর বিড়াল কি করলো ? পাখীরাই বা টের পেলো কিভাবে ? শকুনের কি দশা হলো ? বেচারা জরদ্গবের কতটুকু দোষ ছিল ? কোন খাঁটি কথা সে আমাদের শিখিয়ে গেল ?

কবন্ধ বধ ঃ

১। রামায়ণ রচনা করেন কে ? কোন ভাষায় লেখা? কত বছর আগে ? সোনার লঙ্কা ছারখার হলো কেন ? অন্যদের তুলনায় রামকে শ্রেষ্ঠ চরিত্র বলা হয়, এর কারণ কি ?
২। কবন্ধ রাক্ষসের চেহারা কিরকম ছিল ? তাকে দেখে সবাই আঁতকে উঠত কেন ? কবন্ধ রাক্ষসের কবলে পড়ে লক্ষ্মণ কি বলেছিলেন ? তাই শুনে রাম কি উত্তর দিলেন ? কি-ভাবে কবন্ধ বধ হলো ?
৩। কবন্ধ রাক্ষসের আসল পরিচয় কি ? তার চেহারা কি কারণে কুৎসিত হয়েছিল ? সবশেষে রাম-লক্ষ্মণ কি উপদেশ লাভ করলেন ?

মহাপ্রস্থানের পথে ঃ

১। মহাভারত কে লিখেছেন ? এই বিশাল মহাকাব্যে কত পর্ব আর কত শ্লোক রয়েছে ? কতবছর আগে এবং কোন ভাষায় লেখা ? মূল গল্পটি কাদের নিয়ে লেখা ? অন্ততঃ দশ-বারোটি প্রধান প্রধান পুরুষ ও নারী চরিত্রের নাম উল্লেখ কর।
২। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করার পরও যুধিষ্ঠির মনে মনে দুঃখ পেলেন কেন ? সিংহাসনে বসে পর পর কি কি দুঃসংবাদ শুনলেন ? তারপর পাঁচভাই মিলে কি ঠিক করলেন ? দ্রৌপদী কি করলেন ? দামী দামী কাপড় চোপড় বা গয়নাগাঁটির কি ব্যবস্থা হলো ? অর্জুন কোন দুটি জিনিষের মায়া ছাড়তে পারেন নি। কিন্তু সবশেষে কি কাজ করলেন ?
৩। মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী। যুধিষ্ঠিরকে বাদ দিয়ে অন্য চার ভাই আর দ্রৌপদীর কি দশা ঘটলো ? যুধিষ্ঠির এর কি কি কারণ শোনালেন ?
৪। দেবরাজ ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য ডাকলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে কি উত্তর দিলেন ? কুকুরটি ফেলে রেখে তিনি স্বর্গে যেতে চাননি কেন ? কুকুরটির আসল পরিচয় কি ? তিনি কি বলে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করলেন ?

মিডাসের স্বর্ণপিপাসা ঃ

১। প্রাচীন ইউরোপে গ্রীসের কদর সব চাইতে বেশী কেন ? তখনকার দু-চারজন বিখ্যাত মানুষের নাম বল। তাদের দেবরাজের নাম কি, এবং তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জান লিখ।
২। রাজা মিডাসের স্বভাবটি কিরকম ছিল ? স্বর্গের দেবতার কাছে মিডাস কি বর প্রার্থনা করলেন ? তারপর কি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো এবং মিডাস আনন্দের চোটে লাফাতে থাকলেন কেন ?

৩। হাজার হাজার মন সোনার মালিক হবার পরেও মিডাসের অস্বস্তি হচ্ছিল কেন? তাঁর বড় আদরের ছোট্ট মেয়েটির কি দশা ঘটলো? মিডাস কিভাবে আগেকার জীবন ফিরে পেলেন এবং দেবতা কি উপদেশ দিলেন?

সেরা সম্পদ :

১। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল? দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে যে সিংহাসনটি উপহার দেন, তাতে ক'টি পুতুল খোদাই করা ছিল? বিক্রমাদিত্যের জীবন শেষ হওয়ার পর সিংহাসনটিকে কোথায় রাখা হলো? অনেককাল বাদে ভোজরাজ কিভাবে ঐ সিংহাসনটিকে আবিষ্কার করেন? পুতুল এবং ভোজরাজের মধ্যে কি কি কথাবার্তা হলো?

২। পুরন্দরপুরীতে এক ধনী সদাগর বাস করতো। তার চার ছেলের জন্য সে কি কি রেখে গেল? শালিবাহন কিভাবে ঐ ধাঁধার জট খুলে ফেললেন?

৩। শালিবাহনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিক্রমাদিত্য অসহায় বোধ করতেন কেন? তপস্যার পর বিক্রমাদিত্য কি প্রার্থনা করলেন? বিক্রমাদিত্যের কাজে ব্রাহ্মণ কেনই বা বললেন : ধন্য মহারাজ, আপনি ধন্য?

বাঘ আর বাঘমারী :

১। বণিকের ছেলে মদনকে বুদ্ধিমান শুক পাখীটি কি উপদেশ দিয়েছিল? মদনের স্ত্রী প্রভাবতীকে ঐ শুকপাখী কতগুলি গল্প বলেছিল? 'শুকসপ্ততি' বইটি কোন ভাষায় এবং কত বছর আগে লেখা?

২। রাজসিংহের স্ত্রীকে লোকে কলহপ্রিয়া বলে ডাকতো কেন? ভয়ঙ্কর বাঘকে দেখে সে চীৎকার করে কি বললো? তা শুনে বাঘই বা ভয় পেলো কেন?

৩। বাঘকে ছুটে পালাতে দেখে শেয়াল অবাক হলো কেন? শেয়াল কি পরামর্শ দিল? চরম বিপদ থেকে কলহপ্রিয়া কিভাবে উদ্ধার পেয়েছিলো?

৪। 'বাঘ পালাচ্ছে বাঘমারীর ভয়ে। কিন্তু শেয়ালের দুর্দশা তার চাইতে বেশী'—শেয়ালের কি দুর্দশা হয়েছিল? কিভাবেই বা সে রেহাই পেলো? শেয়াল শেষ পর্যন্ত কি শিক্ষা লাভ করলো?

জবালা ও সত্যকাম :

১। উপনিষদ কোন ভাষায় লেখা? কারা লিখেছিলেন? কোন ধর্মের লোকদের কাছে এটি পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ?

২। সেকালের ছাত্রেরা কিভাবে লেখাপড়া শিখতো? থাকতো কোথায়?

৩। সত্যকাম যে গুরুর কাছে গিয়েছিল, তাঁর নাম কি? তিনি কী কী প্রশ্ন করেছিলেন?
৪। সত্যকামের মায়ের নাম কি? মা যে গোত্রের পরিচয় জানাল, এককথায় তা কিরকম?
৫। গুরু সত্যকামকে বুকে টেনে নিলেন কেন? সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কাকে বলা উচিত?

স্বার্থপরের বিপদ :

১। জাতক কোন ভাষায় লেখা? জাতকের গল্প শিষ্যদের কাছে কে শোনাতেন? আগের জন্মে বুদ্ধদেবের নাম কি ছিল? বৌদ্ধদের প্রধানতম ধর্মগ্রন্থের নাম কি? কোন বিখ্যাত সম্রাট পৃথিবী জুড়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার ব্রত নিয়েছিলেন?
২। 'বামুন ঠাকুরের ভারি একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।'—এই ক্ষমতাটি কি?
৩। গভীর বনের ভেতর বামুন ঠাকুরকে আটকে রেখেছিল ডাকাতদের প্রথম দল। শিষ্য বোধিসত্ত্ব কিভাবে গুরুদেবকে সাবধান করেছিল? শেষপর্যন্ত গুরুদেবের কি অবস্থা হলো?
৪। দু'দল ডাকাতে লড়াই লাগলো কেন। কজন প্রাণে বাঁচলো? তাদেরই বা কি দশা হলো?
৫। গুরুদেবের কি অপরাধ ছিল? ডাকাতদের অপরাধই বা কি? ঐ ভয়ঙ্কর ঘটনা থেকে বোধিসত্ত্ব কি শিক্ষা পেয়েছিলেন?

আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ :

১। আরব্য রজনীর বিখ্যাত গল্পগুলি কোন ভাষায় লেখা? ঐ গল্পগুলো যখন লেখা হয়, তখনকার বাগদাদে শাসক কে ছিলেন?
২। একজন অচেনা ফকিরের সাথে আলাদীনের আলাপ হয়েছিল। ফকির কি বলে নিজের পরিচয় দিত? আসলে সে কে? কি তার উদ্দেশ্য? তার ফন্দী-ফিকির কি সফল হয়েছিল?
৩। ছেলেবেলার আলাদীন কিভাবে দিন কাটাতো? সংসারের অবস্থাই বা কিরকম ছিল? এরপর ভাগ্য ফিরলো কি করে? আলাদীনের চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ কি ছিল? সাধারণ লোক, এমনকি দৈত্য-দানবও প্রশংসা করত কেন? অন্ততপক্ষে দু-দুবার তার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল কিভাবে?
৪। যাদুকরের পাতা ফাঁদে রাজকন্যা পা রাখলো কিভাবে! সেই মহামূল্যবান আশ্চর্য প্রদীপ কি করে হারালো? অবশেষে শত্রু খতম হলো এবং প্রদীপ উদ্ধার হলো কিভাবে?
৫। আলাদীন দুজন দৈত্যকে কাজে লাগাতো। তারা কারা এবং হাজির হতো কিভাবে? দৈত্যেরা কিভাবে উপকার করতো, সংক্ষেপে দু-চারটি উদাহরণ বল।

দিগ্বিজয়ীর দর্পনাশ :

১। চৈতন্যদেব কোথায় জন্মেছিলেন, কত বছর আগে, কোন তিথিতে? তাঁর ডাকনাম কি, পোষাকী নাম কি, গৌরাঙ্গ বলে ডাকা হতো কেন এবং সন্ন্যাস নেবার পর নতুন কি

নামকরণ হয় ? তাঁর পিতামাতার নাম কি ? তিনি কি কি কথা আমাদের শিখিয়েছিলেন ? তাঁর সাথে সাথে আর কার কার কথা আমরা নিত্য স্মরণ করি ?

২। কেশব আচার্য কোথা থেকে এসেছিলেন ? তিনি কিভাবে দেমাক দেখাতেন, আর কিইবা বলে বেড়াতেন ? নিমাই পণ্ডিতকে দেখে তাঁর কি মনে হয়েছিল এবং কিভাবে তিনি প্রথম আলাপ-পরিচয় করলেন ?

৩। কেশব আচার্যকে দিগ্বিজয়ী বলা হতো কেন ? নিমাই পণ্ডিত কিভাবে দর্পনাশ করলেন ? জয়ী হবার পরেও নিমাই ছাত্রদের কি উপদেশ দিলেন ?

সাচ্চা আর ঝুটা ঃ

১। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কতবছর আগে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁর আসল নাম কি ? তাঁর পত্নীর নাম কি ? তাঁর প্রিয় শিষ্যের নাম কি ? বেশীরভাগ সময় তিনি কোথায় বসবাস করতেন ? তাঁর উপদেশের আসল কথা কি কি ?

২। অজগাঁ থেকে বেরিয়ে চাষী আর চাষী-বৌ কোথায় গিয়েছিল ? অনেকদিনের সাধ-আহ্লাদ কি ? তারা কাদের খপ্পরে পড়েছিল ? ওদের কথাবার্তা শুনে চাষী আর চাষী-বৌয়ের কি ধারণা জন্মাল ?

৩। পাঠশালার পণ্ডিতমশাই কিভাবে চাষী আর চাষী-বৌয়ের ভুল ধারণা ভাঙলেন ? দোকানটা ভক্তের অথবা জোচ্চোরের—কোন কথাটা ঠিক ? গল্পটায় শেষাশেষি কি উপদেশ তিনি দিলেন ?

মেঘকুমারের মুক্তি ঃ

১। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর কতবছর আগে জন্মেছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জান লিখ। তাঁর গুটিকয়েক উপদেশের কথা বল।

২। রাজপুত্র মেঘকুমার কেন মহাবীরের কাছে এসেছিল এবং কি চেয়েছিল ? পর পর দুটি মাঝরাতে কি ঘটনা ঘটলো ? মেঘকুমারের মাথা গরম হলো কেন ?

৩। পূর্বজন্মে মেঘকুমার কী ছিল—মানুষ অথবা পশু ? অপরকে দয়া দেখাতে গিয়ে কিভাবে মরণকে ডেকে নিল ? এ জন্মেই বা তার মেঘকুমার নাম কেন ? সবকিছু বোঝার পর সে কেঁদে উঠল কেন ? মহাবীরের কাছে কি প্রার্থনা জানালো ?

পথের সন্ধানে ঃ

১। গ্রন্থ সাহিব কি ? শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ? পঞ্চ 'ক' বলতে কি বোঝ ? নানক কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? তাঁর ছোটবেলা সম্বন্ধে কি জানো ? সাধু হবার পর তাঁর বেশভূষা কেমন ছিল।

২। মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে কেন বকেছিলেন? তিনি কি উত্তর দিলেন? নানকের মতবাদ শুনে তিনি কি করলেন?

৩। নামাজ কাকে বলে? নামাজের শেষে কাজি নানককে কি বলেছিলেন? নানক কি উত্তর দিলেন? নানকের উপর কাজির শ্রদ্ধা বেড়ে গেল কেন?

সোলমানের বিচার ঃ

১। যীশু কে ছিলেন? তিনি কতদিন আগে জন্মেছিলেন? যীশু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? তাঁর প্রচারিত ধর্মমতকে কি বলা হয়? বাইবেলের কয়টি অংশ? কোন্ অংশে কি বক্তব্য আছে?

২। সোলমান কোথায় রাজা ছিলেন? ভগবান সোলমানকে কি বলেছিলেন? তিনি কি বর চেয়েছিলেন?

৩। দুটি-মহিলার বিরোধ কি নিয়ে? সোলমান কিভাবে বিচার করেছিলেন? প্রকৃত মা কে? কিভাবে নির্ণয় করা গেল।

'দোহাই আপনার? দুধের বাচ্চাকে এমনভাবে মারবেন না হুজুর'—কে কাকে একথা বলেছিলেন? তিনি কেন একথা বলেছিলেন?

প্রথম কোরবাণী ঃ

১। 'প্রথম কোরবানী' গল্পটি কোন্ ধর্মপুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে? 'কোরআন শরীফ' কথার অর্থ কি? কোরআনে মোট কতগুলো বাক্য আছে? কোরআন কোন্ ভাষায় রচিত হয়েছিল?

২। ইব্রাহিম সবাইকে কি বোঝাতেন? ইব্রাহিমের কয়জন স্ত্রী? তাঁদের ও ছেলের নাম কি? সারা কি চেয়েছিলেন?

৩। মরুভূমিতে হাজেরা কি অবস্থায় পড়েছিল? মরুর বুকে গজিয়ে ওঠা ফোয়ারার নাম কি? সেখানে কিভাবে শহর গড়ে উঠল?

৪। আল্লাহর আদেশ কি ছিল? সেই আদেশ পালন করতে ইব্রাহিম কি করেছিলেন? তিনি কেন ও কিভাবে পুত্রকে কোরবানী দিলেন? পরে কি ফিরে পেলেন?

শক্তিময়ী দুর্গা ঃ

১। পুরাণ কথাটির অর্থ কি? কতগুলো পুরান আছে? ভাগবত কাদের ধর্মগ্রন্থ? দুর্গাপূজার কথা কোন্ পুরাণে আছে?

২। কারা কোন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন? ঋষি মায়া সম্বন্ধে কি বোঝালেন?

৩। মহিষাসুর কে? দেবী তাকে কিভাবে ধ্বংস করেন?

৪। দেবতারা আবার কার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন? তাদের অনুচররা কিভাবে নিহত হল?

৫। মহর্ষি মেধসের কাছে পুরাণ শুনে রাজা ও সমাধি কি বলেছিলেন? তাঁরা কি পেয়েছিলেন?